বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

ওঁ

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫১তম বর্ষ ◆ একাদশ সংখ্যা ◆ আষাঢ়, ১৪৩৩ [জুন, ২০২৬]

অর্চক পুরোহিত সম্মেলন, ত্রিপুরা প্রান্ত

ধর্মপ্রসার বিভাগের অভ্যাস বর্গ, ত্রিপুরা প্রান্ত

মাতৃশক্তি বর্গ, ত্রিপুরা প্রান্ত

প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের আচার্য অভ্যাস বর্গ, খড়মাডাঙ্গা, উত্তর বীরভূম, মধ্যবঙ্গ

কল্যাণ বাণী

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।। ১৮/২৭।।

'যিনি অভিলাষী, কর্মফললিপ্সু, লোভী, হিংসুক, অশুচি, সহজে পুলকিত অথবা বিষাদগ্রস্ত হন, তিনি রাজসিক (কর্তা) বলে পরিচিত।'

সম্পাদকীয়...

স্বাধীনতার পর থেকেই অনুপ্রবেশ ভারতবর্ষের মাথা ব্যথার মূখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের বিশাল সীমানা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে থাকা এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া আছে, কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানা ছাড়া। কারণ সেখানে পার্বত্য এলাকা থাকায় সম্পূর্ণ রূপে বেড়া দেওয়া যায়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশ লাগোয়া সীমানার (২২১৭ কিমির মধ্যে ১৬৪৮ কিমি বেড়া দেওয়া হয়েছে কিন্তু ৫৮৯ কিমি যার মধ্যে ১১৩ কিমি নদী অথবা ৪৫৬ কিমি) অনেকটা অংশই বেড়া দেওয়া যায়নি, কারণ কিছুটা পাহাড়-পর্বত-নদীর সমস্যার জন্য, কিন্তু বেশিরভাগ অঞ্চলে তৎকালীন রাজ্য সরকারের অনীহা এবং জমি বন্টন না করার জন্য সম্ভবপর হয়নি। ১৫ বছর পরে মুসলিম তোষণকারী সরকারের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই বিজেপি পরিচালিত সরকার বেড়া লাগানোর জন্য প্রথম সপ্তাহেই ২৭ কিলোমিটার জমি প্রদান করেছে বি.এস.এফ-কে। এছাড়া বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট এই নীতি অবলম্বন করেছেন। ওঁনার এই নীতির ফলে হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ছেড়ে তাদের দেশ বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। আর যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের ধরা হচ্ছে, তাদের ছবি তুলে আঙুলের নিশান নিয়ে রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তারা অন্য কোন রাজ্যে প্রবেশ না করতে পারে। চিন্তাজনক বিষয় হচ্ছে, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সামান্য টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের ভারতীয় আধার কার্ড কিংবা ভোটের কার্ড বানিয়ে দেয়। বাস্তবে এই শ্রেণীর মানুষকে দেশদ্রোহী বলা উচিত। ভারতবর্ষ কোন ধর্মশালা নয়, তাই যে কেউই এখানে অবাঞ্ছিত ভাবে বসবাস করতে পারে না। যে সমস্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হবে না, সেখানে কেন্দ্র সরকার স্মার্ট বর্ডার পরিকল্পনা স্বরূপ আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করেছেন। যা খুবই অভিনন্দনযোগ্য।

ভারতীয় জনজাতীয় সমাজ বর্তমানে ধর্মান্তরণের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এবং তথাকথিত সেকুল্যার তালিবানীরা জনজাতিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছে। এর ফলে সংখ্যালঘুর তকমা এবং জনজাতির জন্য প্রাপ্য সুবিধা, দুইই তারা ভোগ করেছিল। এই সুবিধা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তারা পাচ্ছিল। তাই ধর্মান্তরণের কাজ জোর-কদমে চলছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ধর্মান্তরীদের উভয় লাভ দেওয়া যাবে না বলে রায় দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদি সরকার FCRA আইনকে কড়া করে দেওয়ার ফলে, বিদেশ থেকে ধর্মান্তরণের জন্য আসা অর্থের উপর অনেকটাই লাগাম পড়েছে। তার ফলে মিশনারীদের ধর্মান্তরণের কাজে ভাঁটা এসেছে। সম্প্রতি দিল্লির লালকেল্লা ময়দানে দেশের বিভিন্ন কোনা থেকে আসা জনজাতি ভাই-বোনদের সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এই সম্মেলনে ভগবান বিরসা মুন্ডার 'উলগুলান' এর আয়োজনের পর সর্বকালের বড় আয়োজন হয়েছে। এই সম্মেলন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আয়োজন করেছিল। সেই সমাগম দেখে অনেকেই ভয় পেয়েছে, কারণ তাদের দুষ্টু অভিসন্ধি অর্থাৎ ধর্মান্তরিত করা অনেকটাই বাধা পাবে। বাস্তবে জনজাতি সমাজের উপস্থিতি অভিনন্দনযোগ্য ছিল।

খবরের কাগজে, টি.ভি-তে, সোশ্যাল মিডিয়াতে চর্চার বিষয় হওয়ার জন্য অর্থাৎ ফেমাস হওয়ার জন্য নেতারা যে কোন লক্ষণ রেখাকে লঙ্ঘন করতে পিছুপা হন না। হয়তো তাদের এই কাজের জন্য তাঁরা আইনের মারপ্যাঁচে ফাঁসতে পারেন, তবুও তাঁরা ভাবেন না। বেশি কিছু হলে ক্ষমা চাইলেই সব মাফ হয়ে যাবে। এই সব কিছুই হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার আড়ালে। সংবিধান যে কোন মানুষকে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু সবকিছুর একটা সীমা হয়। বাস্তবে হিন্দু দেব-দেবীর এবং হিন্দু নেতাদের অপমান সূচক বাক্য, সস্তা লোকপ্রিয়তা সাধন পথ্য হয়ে গেছে। কিন্তু যদি কোন কারণে তাঁরা ফেঁসে যান, তাদের সেই কেস থেকে বাঁচবার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর আইনজীবি তো আছেনই। এইসব কারণে জে.এন.ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'ভারত তোরে টুকরে হোঙ্গে' এই ধরনের শ্লোগান দিতে সাহস করে আতঙ্কবাদী পড়ুয়ারা। দেশের অনেক এন.জি.ও-র তো এটাই ব্যবসা হয়ে গেছে, ভারত বিরোধী, সনাতন বিরোধী এজেন্ডাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই ধরনের কাজের পিছনে আমেরিকার জর্জ সোরেশের মতো পুঁজিপতিরা অর্থ যোগান দিয়ে থাকেন।

বাকস্বাধীনতা তার আপন জায়গায় আছে, কিন্তু কাউকে অপমান করে নিজের দোকান চালানোর অধিকার কাউকেই

দেওয়া হয়নি। অন্য কারোর মর্যাদা ভঙ্গ করলে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া দরকার। রাজনীতির নিম্নগামী স্তর যখন ভাষার নামে পরিচয়কে বিষাক্ত করতে থাকে, তখন বোঝা উচিত সমাজের গরিমা ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা-র (MNS) প্রধান এবং তাঁর দল মারাঠি এবং অ-মারাঠির মধ্যে যেভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে, তা কিন্তু শুধুমাত্র দেশের একতাকে আহত করে তাই নয়, বরং সংবিধানের মূল ভাবনাকেও আঘাত দেয়। আইনের দৃষ্টিতে ভাষার আধারে কোন নাগরিককে অপমানিত করা, হিংসা করা, উত্তেজিত করা, ধমকানো ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ১৫৩এ, ২৯৫এ, ৫০৫-৫০৬-এর ধারা অনুসারে অপরাধ। সুপ্রিমকোর্টও অনেকবার স্পষ্ট করে বলেছে, বাক স্বাধীনতার আড়ালে সামাজিক সমরসতাকে আঘাত করা যায় না। রাজনৈতিক মর্যাদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, কংগ্রেস পার্টির নেতারা গত ফেব্রুয়ারি মাসে এ.আই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁদের বিরোধ জানানোর জন্য জামা খুলে প্রদর্শন করেছিলেন। তা কিন্তু কোন মতে সমর্থনযোগ্য ভাবা উচিত না। ওই এ.আই সামিটে ১০০টি দেশের প্রতিনিধিরা এবং অনেক রাষ্ট্রের দেশনায়করা উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের প্রদর্শন দেশের ছবিকে কলঙ্কিত করেছিল। কংগ্রেস নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চোর বলেছিল, নীচ ব্যক্তি বলেছিল, মৃত্যুর সওদাগর বলেছিল, বিষধর সাপের মতো বলেছিল, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মাতাকে নিয়ে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করতে পিছপা হয়নি।

গত ২০শে মে বুধবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তার সংসদীয় ক্ষেত্র রায়বেরেলীতে এক জনসভায় বলেছিলেন, 'যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আর.এস. এস-এর সদস্যরা আপনাদের কাছে আসবেন, তখন বলবেন—আপনার প্রধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী এবং সংগঠন গদ্দার আছে। আপনি দেশ বেচে দেওয়ার কাজ করছেন। খুব তাড়াতাড়ি আর্থিক ঝড় আসছে। মোদি নিজেও আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। মনে রাখবেন যেমন—কোভিড এবং নোট বন্দির সময় উনি মায়া কান্না কেঁদেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি টি.ভি-তে আবার আসবেন এবং কাঁদবেন ও বলবেন, আমার ভুল না'।

সরকারের নীতির উপর প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে, তার নিন্দা করা যেতেই পারে, আলোচনা করা যেতেই পারে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রীকে গদ্দার বলা, কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। ওঁনাদের ভালো বা মন্দ বলা যেতে পারে, কিন্তু ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গদ্দার বলা কি উচিত? এটি কি দেশবাসীর অপমান না? সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর নীতির আলোচনা সভ্য এবং সংসদীয় ভাষায়ও তো করা যেতে পারে। সঠিক তথ্য এবং প্রমাণ সাপেক্ষে আদালতও যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নেতাদের জিহ্বার উপর লাগাম কষা দরকার। নিজের ভাষা চয়ন এবং প্রয়োগ অত্যন্ত সাবধানে করা উচিত। বাস্তবে ভাষা, ব্যক্তির চরিত্র, চিন্তাশীলতা এবং বোধশক্তির দর্পণ। অন্য কাউকে গালমন্দ করে মানুষ আত্মমুগ্ধ হতে পারেন, কিংবা হাততালি কুড়াতে পারেন, কিন্তু সবশেষে আপনার চারিত্রিক ছবিকেই ক্ষতবিক্ষত করে। যেমনটা পশ্চিমবঙ্গের যুব নেতা তথাকথিত নির্বাচনের ভাষণে বলেছিলেন, '৪ তারিখ দুপুর ১২টার পর আসিস। হিম্মত থাকে তো আসিস।' এখন কিন্তু এই নেতাই লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। সবশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যক্তিদের বলতে চাই, শব্দের শালীনতা কখনোই ছাড়াতে নেই।

সম্প্রতি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, দেশের যে সকল স্থানে হঠাৎ করে ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন হয়েছে, সেখানেই বিশেষ নজরদারি দেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকারের সভাপতিত্বে একটি উচ্চস্তরের কমিটি বানানো হয়েছে, সেখানে জনগণনা সেক্রেটারি দুর্গা শংকর মিশ্র (আই.এ. এস), সেবা নিবৃত আইপিএস বালাজি শ্রীবাস্তব এবং ডঃ শমিকারবি সদস্য হবেন। এছাড়া সংযুক্ত সচিব বিদেশ মন্ত্রণালয়, গৃহ মন্ত্রণালয় এই সমিতির সদস্য সচিব হবেন। গৃহমন্ত্রী বলেছেন, জনসাংখ্যিক পরিবর্তন আমাদের সংপ্রভুতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, আইন ব্যবস্থা, সামাজিক সংরচনার মধ্যে ভয়ানক পরিবর্তন এবং জনজাতীয় সমাজের সংরক্ষণ সম্পর্কিত গম্ভীর সমস্যা উৎপন্ন করে। এই সমিতি অবৈধ প্রবেশ এবং অন্য অসামান্য কারণে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের জনসাংখ্যিক পরিবর্তনের ব্যাপক মূল্যাঙ্কন করবে এবং ধার্মিক ও সামাজিক সমুদায়ের স্তরে অসামান্য জনসংখ্যা পরিবর্তনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবে এবং সু-নিয়োজিত এবং সময়বদ্ধ সমাধান প্রস্তুত করবে। এই আদেশ দেশের হঠাৎ করে জনবিন্যাস পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

শ্রাবণ ১৪৩৩ (জুলাই ২০২৬) : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জন্মদিবস, রথপূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা, স্বামী তুলসী জয়ন্তী, করপাত্রীজি মহারাজ জয়ন্তী, পূর্ণযাত্রা বিবিধ।

ভাদ্র ১৪৩৩ (আগস্ট ২০২৬) : স্বাধীনতা দিবস, ঝুলন যাত্রা, মনসা পূজা, শিক্ষক দিবস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস, জন্মাষ্টমী, বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ॐ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪
দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯, দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭

pnb SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP
9038149815m@pnb
MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ ✻ একাদশ সংখ্যা ✻ আষাঢ়, ১৪৩৩ (জুন, ২০২৬)

'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর
● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস
● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল
● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)
● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়	৩
নারদজয়ন্তী—আলপনা ঘোষাল	৬
যুগাবতার শঙ্করাচার্য—গোপাল চক্রবর্তী	৮
জগতের গুরু—তমাল ভট্টাচার্য	১০
বর্ষপ্রতিপদ ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার —সরোজ চক্রবর্তী	১২
ফলহারিণী কালীপুজো : নারী শক্তির উৎস—রবিব্রত ঘোষ	১৩
ওঙ্কার : হিন্দুত্বের মূল মন্ত্র—প্রোজ্জ্বল মণ্ডল	১৫
সনাতন সংস্কার 'অম্বুবাচী' : শব্দজ শিকড়-সন্ধান —শ্যামলচন্দ্র দাস	১৭
সোমনাথ মন্দির আমাদের পরম্পরার অখণ্ডতার প্রতীক —আদিত্য দেব	২০
বৈচারিক বিষ থেকে মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ —দিলীপ কুমার ঝাঁওর	২২
যোগাভ্যাসের জ্ঞান ভারতবর্ষ দিয়েছে সমগ্র বিশ্বকে —রাজকুমারী মাহেশ্বরী	২৪
ধর্ম পরিবর্তন : বিভিন্ন পন্থা থেকে সাবধান—ড. জয়ন্ত বিশ্বাস	২৬
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি : এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান —পারমিতা পাল	৩০
পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের জয় হয়েছে—কিন্তু সতর্কতাও দরকার —ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ	৩২
ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিকথা—মনোজ শা	৩৪
ভারতের জন্য বিপদসঙ্কেত—সুদীপনারায়ণ ঘোষ	৩৫
কবিতা : তিনশো একুশ—সৌমিত্র ঘোষ	৩৭
শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রাসঙ্গিকতা : হিন্দুস্তানের খ্রিস্টায়ন ও ইসলামায়নের অতীত ও বর্তমান—ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়	৩৮
শ্রী বিগ্রহ পূজনবিধি—অরুণ চুড়ীবাল	৪১

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান :
জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

চিঠিপত্র বিভাগ
পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াটঅ্যাপ করুন
৭৮৭২৪৬১৬১৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com
প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন **e-mail** কিংবা **WhatsApp**-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

নারদজয়ন্তী

আলপনা ঘোষাল

হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেব-দেবী ও পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে এক রহস্যময় ও ব্যতিক্রমী চরিত্র 'দেবর্ষি নারদ'। তিনি বীণা হাতে দেবলোক মর্ত্যলোক ও পাতাললোক সব লোকেই বিচরণ করেন এবং ঈশ্বরের দূত হিসাবে কাজ করেন। বিশ্বাস করা হয় তিনি মেঘের মতো দ্রুতগামী এবং সর্বত্রগামী। দেবলোক থেকে যমলোক সব স্থানে তিনি সমান জনপ্রিয়। তা সত্ত্বেও তিনি দেবতা হিসেবে পূজিত হন না। তাঁর সম্ভাষণে নারায়ণঃ, সম্মতিতে নারায়ণঃ, বিদায় বেলাতেও নারায়ণঃ। নারদের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রচলিত চিহ্নই হল মুখে সর্বদা 'নারায়ণঃ নারায়ণঃ' জপ। নারদ বিষ্ণুভক্তির এক শক্তিমান পরাকাষ্ঠা, যিনি যে কোন ব্যক্তিকে প্রচার করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং সাধুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিমূলক সেবায় নিমগ্ন এবং তাঁর মহিমা প্রচারে নিযুক্ত। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ একজন ত্রিকালজ্ঞ, বেদজ্ঞ ও তপস্বী। তাঁর বৈরাগ্য ও জ্ঞানের জন্য তিনি 'দেবর্ষি' উপাধিতে ভূষিত। তাঁর নামেরও একটি অর্থ আছে। 'নার' শব্দের অর্থ জল। ইনি সব সময় তর্পনের জন্য জল দান করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছে 'নারদ'।

নারদের বাহন ঢেঁকি, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু শাস্ত্রে তার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রবাদের মূলে কোনো সত্য আছে কিনা, তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে যে চিত্র পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তাঁর বাহন সমেত তিনি স্বমহিমায় বিরাজমান। এই বাহন চড়েই তিনি একলোক থেকে আরেক লোকে ছুটে বেড়াতেন। শাস্ত্রে তাঁকে মহাজ্ঞানী বলা হয়েছে, কারণ তাঁর কোন জ্ঞান একটি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বহুক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল। প্রথমতঃ তিনি বেদ ও উপনিষদের গভীর জ্ঞানী ছিলেন। মহাভারতের সভা পর্বে তাঁকে এমন এক ঋষি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ন্যায়, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ এবং ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তাঁর ত্রিকালদর্শিতা, দেবর্ষি সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। কারণ তিনি সময়সীমা অতিক্রম করে ঘটনাগুলোকে মূল্যায়ন করতে পারতেন। এই জন্যই তিনি দেবতা, মনুষ্য ও অসুর এই তিন লোকে সমানভাবে সম্মানিত ছিলেন। এছাড়া আজ যাকে আমরা 'কমিউনিকেশন' বলি তার প্রাচীন ও কার্যকর রূপ ও নারদ মুনির মধ্যে দেখা যায়। তিনি সঠিক সময়, সঠিক স্থানে উপস্থিত হয়ে সংযোগ স্থাপন করতেন এবং জটিল পরিস্থিতিকে সঠিক দিশা দিতেন। তিনি রহস্যবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। নারদ একজন পণ্ডিত ছিলেন। জানা যায় ৮৪টি ভক্তি সূত্র তিনি রচনা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভক্তি সূত্রের উপর ভাষ্য দিয়েছিলেন। নারদ পুরা, নারদ স্মৃতি, নারদ ভক্তিসূত্র এই সমস্ত কিছু পড়লে জানা যাবে সাংবাদিকতার নীতি এবং পদ্ধতি। দৈত্য থেকে মানব, মানব থেকে দেবতা প্রত্যেকের দরবারেই মহর্ষি নারদকে যেতে হতো খবর সংগ্রহের জন্য। তাঁর কাজ ছিল, যে বার্তা তিনি পেতেন এবং যার উদ্দেশ্যে পেতেন সেটা সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানো পর্যন্ত। তিনি তিন লোকের সংবাদ লোককল্যাণের জন্য আদান-প্রদান করতেন।

কিন্তু ত্রিলোকের এই মহাজ্ঞানী নারদ মুনিকে চলচ্চিত্রে পাওয়া যায় একজন ভাঁড় বা ক্লাস সৃষ্টি করা চরিত্র হিসাবে। এমনকি তাঁর চরিত্রটিকে প্রায় সেই সব অভিনেতাদের দেওয়া হতো, যাঁরা সাধারণত খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর চরিত্র এবং জ্ঞানের খ্যাতি দেবতাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নারদ মুনিকে তাঁর প্রকৃত রূপে জানার পরিবর্তে সমাজে একটি কমিক চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁরা শাস্ত্র পড়ার পরিবর্তে, তাঁর উপর কমিক চরিত্র নির্মাণ করেছেন। যিনি বেদের জ্ঞানী, সংগীতের আচার্য এবং লোক কল্যাণের দূত ছিলেন, সেই নারদ মুনিকে ভাঁড়ে পরিণত করা শুধু অজ্ঞানতাই নয়, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার প্রমাণ।

আমাদের হিন্দু ধর্মে আলাদা আলাদা দেবতাকে আমরা এক বিশেষ বিশেষ কাজের দেবতা হিসেবে মান্যতা দিয়েছি। যেমন—বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী, ধনের দেবী মা লক্ষ্মী,

শক্তির জন্য উপাসনা করে থাকি হনুমানজি এবং মা দুর্গার। ঠিক একইভাবে সম্পাদনার বা যোগাযোগের কাজে নারদ মুনিকে স্মরণ করা উচিত, কারণ তিনি ছিলেন বার্তাবাহক বা প্রাচীন ভারতের সাংবাদিক। ভারতের প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'উদন্ত মার্কেণ্ডেয়', প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৩০শে মে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। ঘটনাচক্রের সেদিন ছিল বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয় তিথি, যা 'নারদজয়ন্তী' নামে প্রসিদ্ধ। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীর পর নারদজয়ন্তী অর্থাৎ মহর্ষি নারদের জন্মবার্ষিকী একটি গুরুত্বপূর্ণ তিথি হিসেবে গণ্য করা হয়। নারদজয়ন্তী উৎসবের দিনে বিশেষ সৎসঙ্গ, পুজো এবং জ্ঞানমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক জায়গায় সাংবাদিকদের সম্মানিতও করা হয়। হিন্দু সংস্কৃতিতে দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীতে বীণা, বই এবং নারায়ণের মূর্তি বা ছবির সামনে, 'ওঁম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোঃ' মন্ত্র জপ করে পুজোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। ■

বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি : ১৫ই মে, ২০২৬। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি, প্রবীণ আইনজীবী শ্রীঅলোক কুমার, ভোজশালা মামলায় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তটি ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনা, সত্য এবং শাশ্বত ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে ধারের ভোজশালা একটি হিন্দু মন্দির। আদালত বলেছে যে ভোজশালায় পূজার রীতি বরাবরই একটি হিন্দু মন্দিরের মতোই ছিল। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দুরা এখন ভোজশালায় পূজা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার লাভ করেছেন। মুসলমানদেরও মসজিদের জন্য সরকারের কাছে জমি চাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আমরা আশা করি, ভোজশালা কেবল দেবী বাগদেবীর পূজাস্থল হিসেবেই থাকবে না, বরং প্রাচীনকালের মতোই সংস্কৃত ও ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এই কাজটি সমাজ এবং সরকারকে যৌথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এই স্থানের শক্তি সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক আলো ছড়িয়ে দেবে।

তিনি বলেন যে, সম্পূর্ণ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। আদালত এই বিষয়ে ভারতের সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এএসআই-কে (ASI) একটি তদন্ত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছিল। তদন্তের একটি অনুলিপি উভয় পক্ষকে প্রদান করা হয়েছিল, যাতে তারা তাদের মতামত উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট সময় পায়। বিজ্ঞ বিচারপতিগণ ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ভবনটি পরিদর্শন করেন।

শ্রীঅলোক কুমার আরও বলেন যে, একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরিচালনা, সকলের বক্তব্য শোনা এবং স্বচক্ষে ভবনটি দেখার পরেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। উপলব্ধ ঐতিহাসিক সাহিত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং হিন্দু পূজার অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, মাননীয় হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে ভোজশালা ছিল শব্দের দেবী সরস্বতীর একটি প্রাচীন মন্দির এবং সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্তটি কেবল একটি স্থানের বিষয় নয়, বরং এটি ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং সভ্যতার পরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত। এই সিদ্ধান্তটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং উত্তম। সকলের এটি মেনে নেওয়া উচিত।

লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থাপিত দেবী সরস্বতীর মূর্তিটি ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন বিবেচনা করার আদালতের পর্যবেক্ষণকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই মূর্তিটি ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মার প্রতীক এবং এটিকে এর মূল স্থান ভোজশালায় পুনঃস্থাপন করা উচিত। শ্রীঅলোক কুমার আরও বলেন যে, এই বিষয়টি কারও পরাজয় বা বিজয়ের বিষয় নয়। আমাদের সকলকে আদালতের আদেশ এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করতে হবে। সকল পক্ষকে শান্তি, সম্প্রীতি এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্য আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত কোনো সম্প্রদায়ের পরাজয় নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্য ও সাংস্কৃতিক ন্যায়বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভোজশালা মন্দিরে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।

প্রকাশক—
বিনোদ বনসাল
জাতীয় মুখপাত্র, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

যুগাবতার শঙ্করাচার্য

গোপাল চক্রবর্তী

তখন সনাতন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও ধর্মে এক সংকটকাল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরব সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে হিন্দু দেশ জয় করেছে, সুলতানও তার করায়ত্ত। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধদের আগ্রাসনে ক্ষেত্র বিশেষে সনাতন হিন্দুধর্ম বিপন্ন। এই সময়ে আবির্ভাব যুগাবতার আচার্য শঙ্করের। এই অবতার পুরুষের অসাধারণ প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি সনাতন ভারতবর্ষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ধর্ম সংকট থেকে উত্তীর্ণ করেন।

৭১০ শকাব্দের (৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথির মধ্যাহ্নে কেরল প্রদেশের কালাড়ি গ্রামে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ 'শিবগুরু'র সতী-সাধ্বি পত্নী 'বিশিষ্টা দেবী' জন্ম নিলেন এক অনিন্দ্য সুন্দর পুত্র সন্তানের। অপুত্রক শিবগুরু তার বিশিষ্টা দেবী কালাড়ি গ্রামে জাগ্রত শিবচন্দ্র মৌলিশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন এক বংশ প্রদীপের জন্য। এই ব্রাহ্মণ দম্পতি হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন এই শিব মন্দিরে। একসময় শিবগুরু মহেশ্বরের স্বপ্নাদেশ পেলেন। মহেশ্বর তাকে বলেছেন, 'বৎস্য শিবগুরু তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমাকে বরদান করছি, শিবকল্প মহাজ্ঞানী পুত্র তুমি লাভ করবে, আর দিকে দিকে ঘোষিত হবে তার জয়বার্তা।' শিবের বরে পুত্র লাভ তাই শিবগুরু পুত্রের নামকরণ করলেন শঙ্কর। শৈশব থেকেই শঙ্কর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য শ্রুতিধর। একবার যা শোনেন, তা অন্তরে গাঁথা হয়ে যায়। মাত্র তিন বছর বয়সে, সমগ্র মালায়ালাম সাহিত্য তাঁর কণ্ঠস্থ। কিন্তু এই প্রতিভাধর পুত্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ পিতা দেখে যেতে পারলেন না। অকস্মাৎ তাঁর জীবনাবসান হয়। এই বিপদেও মাতা বিশিষ্টা দেবী পুত্রের মুখ চেয়ে অবিচলিত থাকলেন। পাঁচ বছর বয়সে শঙ্করের উপনয়ন হল এবং অধ্যায়নের জন্য তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হল। মাত্র দু-বছরের মধ্যে তিনি চতুষ্পাঠীর সমস্ত পাঠ আয়ত্ত করে ফেললেন। বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম হয়ে উঠলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে শঙ্কর নিজে চতুস্পাঠী খুলে বসলেন। প্রথম দিকে নিতান্ত বালক অধ্যাপককে প্রবীণরা ব্যঙ্গ করলেও, অল্প সময়ের মধ্যে তারা এই বালকের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। যুগাচার্যের ভূমিকা গ্রহণের জন্য শঙ্করের আবির্ভাব। শঙ্কর প্রভাতের বালক নয়, মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড।

মাতা বিশিষ্টা দেবীর বয়স হয়েছে। রোজ নদীতে স্নান করতে যান, যা বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। একদিন তাঁর মাতা স্নানে যাবার সময় পথে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। ব্যথিত পুত্র ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন 'আলোয়াই' নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যেন তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই বালক ব্রহ্মচারীর প্রার্থনা ভগবান অচিরেই পূরণ করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তটদেশ ভেঙে আলোয়াই তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। বিদ্বান শঙ্করের এই অলৌকিক শক্তির কথা তখন চারিদিকে প্রচারিত। এই সংবাদ কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কাছে পৌঁছলে রাজা শঙ্করকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। শঙ্কর প্রাসাদে যেতে অসম্মত হলে, রাজা স্বয়ং শঙ্করের কাছে এসে তাঁকে অজস্র অর্থ দান করতে চান। শঙ্কর তাতেও সম্মত হলেন না। রাজা শঙ্করের কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হলেন।

শঙ্করের খ্যাতি তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময় কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এলেন শঙ্করের গৃহে। দীর্ঘ আলোচনার পর বালকের অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ ব্রাহ্মণরা বিশিষ্টা দেবীর কাছে শঙ্করের জন্ম কুণ্ডলী দেখতে চাইলেন। কিন্তু জন্ম কুণ্ডলী দেখে তাঁদের মুখের ভাষা হারিয়ে গেল। কারণ এই বালক ছিল স্বল্পায়ু। মাত্র ১৬ এবং ৩২ বছর বয়সে এর মারাত্মক মৃত্যুযোগ। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা চলে গেলেন, কিন্তু বালক শঙ্করের চেতনার মর্মমূলে সেদিন একথা এক প্রকাণ্ড আঘাত করল। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জেগে উঠতে চাইছে, মোক্ষ প্রাপ্তির আকুতি নাড়া দিচ্ছে সর্বসত্তায়।

এবার শঙ্কর জননীর কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে সৎগুরুর সন্ধানে বেরোতে চান। শঙ্কর বিধবার নয়নের মণি, প্রাণ স্বরূপ। জননী কিছুতেই শঙ্করকে সন্ন্যাস নেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

এর মধ্যে একদিন ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। মায়ের সঙ্গে আলোয়াই নদীতে স্নান করছেন শঙ্কর। অপ্রশস্ত, অগভীর আলোয়াই নদী, কিন্তু সেদিন এক কুমির এসে আক্রমণ করল শঙ্করকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শঙ্কর মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন—

''মাগো আমি মরতে চলেছি, কিন্তু দুঃখ রইল যে, সন্ন্যাস নিয়ে আমার মুক্তি ঘটলো না। মা তুমি অনুমতি দাও আমি অন্তত সন্ন্যাস নিয়ে, ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি।''

আকস্মিক বিপদে দিশেহারা জননী পুত্রের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য বললেন—

''বাবা! তাই হোক তোকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিচ্ছি।''

একথা উচ্চারণ করে জননী ঘাটে, মুর্ছিতা হয়ে পড়লেন। এদিকে কোলাহল শুনে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা লাঠি, দা, বর্শা প্রভৃতি নিয়ে কুমিরকে আক্রমণ করে শঙ্করকে উদ্ধার করল।

আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও শঙ্কর মায়ের অনুমতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনেপ্রাণে সন্ন্যাসী হলেন। তিনি আর গৃহবাসী হবেন না। মায়ের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে, শঙ্কর চললেন সদগুরু সন্ধানে। যাবার সময় মাকে কথা দিয়ে গেলেন, অন্তিম সময়ে তিনি মায়ের কাছে আসবেন। দীর্ঘসময় এবং দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে বালক সন্ন্যাসী পৌঁছে গেলেন ওঙ্কার শৈলে। এখানে এক গুহায় ধ্যানস্থ ছিলেন 'মহাযোগী গোবিন্দপাদ'। তাঁর কৃপা লাভ করে, তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। এরপর তিন বৎসর কাল কঠোর সাধনায় রত হন শঙ্কর। এই সময় তিনি এক অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। একদা বর্ষা ঋতুতে নর্মদার বন্যায় আশ্রম ভেসে যায়, গুরু গোবিন্দ পাদ তখন গুহায় সমাধিমগ্ন ছিলেন। গুহাটাও ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। শঙ্কর তখন একটি কলসি গুহামুখে রাখেন, স্ফীত জলরাশি সেই কলসিতেই প্রবিষ্ট হয়ে যায়। আশ্রম এবং গুহা উভয় রক্ষা পায়। শঙ্করের উপরে ধর্ম বিমুখ ভারতবাসীকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনায় এবং অদ্বৈত জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করার দায়িত্ব দিয়ে এবং তাকে কাশি গমনের নির্দেশ দিয়ে গুরু গোবিন্দপাদ যোগবলে দেহত্যাগ করলেন।

কাশিধামে শঙ্কর অলৌকিকভাবে দেবী অন্নপূর্ণা এবং স্বয়ং বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বিশ্বনাথের থেকে, প্রকৃত অদ্বৈত তত্ত্বের ধারণ-বাহক হতে হবে এবং বৈদিক জ্ঞানের ধারাকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে এই নির্দেশ পাওয়ার পর, শঙ্কর স্থির করলেন ব্যাসদেবের তপস্যাপূত ঋষিকেশে বসেই তিনি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করবেন। কয়েক জন ঘনিষ্ঠ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঋষিকেশে পৌঁছলেন। বহুকাল পূর্বে চৈনিক দস্যুদের ভয়ে গঙ্গা-বক্ষে লুকিয়ে রাখা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর বিগ্রহটি তিনি যোগবলে পুনরুদ্ধার করে মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। অনুরূপভাবে বদ্রিনাথের শিব বিগ্রহটিও দস্যুদের ভয়ে এক বিপদজনক গোপন কুণ্ডে নিমজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। শঙ্কর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুণ্ড থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পবিত্র ব্যাসতীর্থে বসে শঙ্কর রচনা করলেন ১৬ খানি শাস্ত্র গ্রন্থের মহাভাষ্য, যা বিশ্ব মানবের জ্ঞান ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ। তাই শুধু নয় লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও অদৈত্ববাদের প্রচারের মধ্যে দিয়ে উত্তরাপথের বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রধান অঞ্চলগুলোতে বৈদিক আচার-আচরণ আবার প্রতিষ্ঠিত হল।

কথিত আছে উত্তরকাশীতে শঙ্কর স্বয়ং ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ব্যাসদেব শঙ্করের আরো ১৬ বছর আয়ু বৃদ্ধি করে দ্বিগবিজয়ী পণ্ডিতদের তাঁর স্বমতে আনার নির্দেশ দেন। শঙ্কর বললেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। নির্গুণ নিরূপাধিক এবং জ্ঞান স্বরূপ পরমব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং পরমতত্ত্ব আর এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্ত কিছুই মায়ার লীলা, বৈচিত্র্য, অনিত্য। শঙ্করের একমাত্র লক্ষ্য সারা ভারতে অদ্বৈতবাদের পতাকা উড্ডীন করা। মীমাংসা দর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য কুমারিল ভট্টকে তর্কে পরাজিত করতে পারলে এই লক্ষ্য কিছুটা সফল হবে। শঙ্কর পৌছলেন কুমারিল ভট্টের কাছে। কিন্তু তিনি তখন আপন কৃতকর্মের জন্য তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাঁর নির্দেশে শঙ্কর গেলেন তাঁর সমকক্ষ, তাঁর প্রধান শিষ্য মণ্ডল মিষ্টির কাছে মণ্ডণ মিশ্রের কাছে। মণ্ডণ মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করলেন। এই তর্কের বিচারক ছিলেন মণ্ডণ মিশ্রের বিদূষী স্ত্রী 'উভয় ভারতী'। সর্বশাস্ত্রে শঙ্কর, মণ্ডণ মিশ্রকে পরাজিত করেন। কিন্তু উভয় ভারতী বললেন, তাকে পরাজিত করতে না পারলে তার জয় সম্পূর্ণ হবে না। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হলেও কামশাস্ত্র বিষয়ে শঙ্কর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উভয় ভারতীর কাছে একমাস সময় নিয়ে শঙ্কর আপন দেহ শিষ্যদের কাছে গচ্ছিত রেখে, সূক্ষ্ম দেহে

প্রবেশ করলেন এক সদ্য মৃত রাজার শরীরে। এক মাসের মধ্যেই সেই রাজার রানীদের কাছ থেকে কামশাস্ত্রের পাঠ নিয়ে, আবার প্রবেশ করলে নিজের দেহে। এবার কামশাস্ত্রে পরাস্ত করলেন উভয় ভারতীকে। স্বস্ত্রীক মণ্ডণ মিশ্র আচার্য শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এইভাবে দিগ্বিজয় পর্ব সমাপ্ত করলেন আচার্য শঙ্কর।

বদ্রীধাম থেকে রামেশ্বর, দ্বারকা, কামাক্ষা প্রভৃতি আধ্যাত্ম্য সাধনার সকল ক্ষেত্রই আচার্য শঙ্করকে সেদিন অবতার পুরুষ রূপে মেনে নিয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ দ্বারা হয়েছে সকলে প্রভাবিত। ভারতের চার প্রান্তে, চারটি বিশিষ্ট ধামে, চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে শংকর সারা ভারতে ধর্মীয় অনুশাসন রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন। এই মঠগুলো হল—দ্বারকার সারদামঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ, জ্যোতি ধর্মের যোশীমঠ এবং রামেশ্বরের শৃঙ্গেরী মঠ। আচার্য শঙ্কর প্রধান প্রধান শিষ্যদের এই মঠ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করে আচার্য শঙ্কর অপরূপ সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দেন। এবার আচার্যের চির বিশ্রামের পালা। ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে এক স্তবগাথা রচনা করে ৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলীন হয়ে যান মহা সমাধিতে। ■

জগতের গুরু

তমাল ভট্টাচার্য

প্রবাহিত পূর্ণা নদী, কেরালার এক প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত গ্রাম, আশ্চর্য দিব্য বালক স্নান করছেন তীরে দাঁড়িয়ে, মা আর্যাম্ভাদেবী তা দেখছিলেন। হঠাৎ বিধবা মায়ের একমাত্র বল ভরসার স্থল, সেই দিব্য বালক চিৎকার করে উঠল, পায়ের পেশীতে ধারালো দাঁত বসিয়েছে একটি কুমির, তাকে টেনে নিয়ে চলেছে নদীর গভীরে। বালকটি বলে উঠল—'মা শরীর যে যায়, মৃত্যু সম্মুখে, এখনও কি ত্যাগের পথে যাবার অনুমতি দেবে না?' মাতৃহৃদয় ব্যাকুল, বহু মানতে শিবের কাছ থেকে পাওয়া সন্তান। কিভাবে ক্ষুরধারার মতো পথে ঠেলে দেবেন বাছাকে? ভাবনার মেঘ রাশি ছিন্ন-ভিন্ন হল বালকের আর্তনাদে। বুকে পাথর রেখে মা বললেন, 'অনুমতি দিলাম'। একি দৈব লীলা? কোথায় কুমির? পা ছেড়ে জলে চলে গেছে কুমির। আর আশ্চর্য বালক সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত, যিনি পরবর্তী কালে হবেন ধর্ম রক্ষক ও সংস্কারক। তিনি মায়ার সংসারে কিভাবে থাকবেন? জগৎ অপেক্ষা করে আছে শিব স্বরূপ ভগবানের পদধূলির জন্য। ভাবিকালে জগৎ তাকে আচার্য শঙ্কর বলে জানবেন।

সনাতন ধর্মের প্রতি আচার্য শঙ্করের অবদান প্রচুর। তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মকে পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক সাধনার বিকৃত রূপ বৌদ্ধ ধর্মের ভাবমূর্তি নষ্ট করে দিয়েছিল। নৈতিক অধঃপতনে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। এমতবস্থায় আচার্য শঙ্কর সনাতন হিন্দু ধর্মের জাগরণ ঘটিয়ে সমাজকে নতুন আলোক দান করেন। শিবাবতার আচার্য শঙ্কর ছিলেন স্বল্পায়ু। মাত্র ৩২ বছরের জীবনে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে অদ্বৈত বেদান্তবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। বদ্রীনাথ ধামে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরি মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, গুজরাটে দ্বারকা মঠ স্থাপন আচার্যের এক অনবদ্য কীর্তি। বৈদিক ভাবনায় সন্ন্যাসীদের তিনি সুগঠিত করেন এবং দশটি পৃথক ধারায় ভাগ করেন, যা দশনামী হিসেবে পরিচিত। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ধারায় গণেশ, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, সূর্য, পঞ্চদেবতার পূজা প্রচলন করেন। আজ যে স্তবগুলো মঠ ও মন্দিরে পঠিত হয়, তার অধিকাংশই তিনি তৈরি করেন। 'ভাগবত গীতাকে' পৃথকভাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সবই ব্রহ্ম স্বরূপ) এই ধারণার প্রবক্তা হলেন আদি শঙ্কর। হিন্দুধর্ম বেদান্তের এই চিরসত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যদিকে আবার এটাও বুঝতে হবে, এই সবই যদি ব্রহ্ম স্বরূপ হবে, তাহলে তো 'তোমার/আমার মধ্যে যিনি, দুলে, বাগদি, ডোমের মধ্যেও তিনি' (মা সারদার বাণী)। এটি সাধারণ মানুষের উপলব্ধি হয় না কেন? কারণ, আমরা মায়ার আচ্ছাদনে ঢাকা এবং অহংবোধ আমাদের মধ্যে আছে। সৎ গুরুর করুণা ধারায় এই মায়া কাটিয়ে জীব ব্রহ্ম উপলব্ধি করে, সকলকে সমান দেখে। বর্তমান বিশ্বে যখন তথাকথিত কিছু মানুষ নব্য ধর্মের দাবি করে এবং তারা মানুষে মানুষে সমানতার কথা বলে। কিংবা বিদেশী

রাজনৈতিক মতবাদি একটি রাজনৈতিক দল যখন নিজেদের সাম্যবাদের উদগতা বলে প্রচার করে, তখন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, অষ্টম শতাব্দীতে সনাতন ধর্মে এই সাম্যের গান গীত হয়েছে, যে স্বর আজও বাজে উপনিষদের ঝঙ্কারে। এর প্রচার-প্রসার সনাতন ধর্মের আদি রক্ষক ও জগৎ গুরু শঙ্করাচার্য করে গেছেন।

৬৪০ শকাব্দে যোগ অবলম্বনে হিমালয়ে আচার্যের তিরোভাব হয়। একদা পশুপতি মহেশ্বর স্বেচ্ছায় মায়াবলম্বনে শরীর ধারণ করে ৩২টি বছর হিন্দু ধর্মকে সুসংহত করেছিলেন। কাজ ফুরোতেই সেই পরমব্রহ্ম স্বরূপ জীর্ণ বস্ত্রের মতো শরীর ত্যাগ করে ফিরে গেলেন নিজ ধামে। জগৎ অপেক্ষায় রইল কখন আবার শিব স্বরূপ অবতার দেহ পরিগ্রহ করবে, ভারত ভূমি প্রতীক্ষায় রইল কখন আবার সেই শিবাবতার ভারত পরিভ্রমণ করে ভারত আত্মার পুনর্জাগরন ঘটাবে, সনাতন ধর্ম প্রতীক্ষায় রইল কবে আবার আসবে শিবাবতার এবং সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়ে বেদান্তের জয়গান গীত হবে। শুধু প্রকৃতি মাতা অপেক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর প্রার্থনায় রইলেন, এবার এলে ৩২টি নয় আরো কয়েকটি বসন্ত যেন তাঁর আরাধ্য অতিবাহিত করেন। বেশি নয়, আরো যদি অন্তত ৭টি বসন্ত লীলাটিকে দীর্ঘায়িত করা যায়! হয়তো এত অপেক্ষা, এত প্রার্থনা মঞ্জুর হল। পরের লীলাটি ৩৯ বছর পর্যন্ত এই গঙ্গাতীরে কলকাতায়। ইতিহাস নিজেকে পুনঃপ্রবৃত্তি করে, কাশির বিশ্বনাথ ধাম থেকে কলকাতার সিমলা পর্যন্ত জ্যোতির রেখা ধরা পড়ল সঠিক চক্ষে। এই মহামানব আবারও আসে। শিব শিব শিব তাঁর পদ্ম পলাশ আঁখিতে করুণা বিন্দু ঝরে। সনাতন জয়ী হয় ডমরুর ধ্বনিতে। সাধক গেয়ে ওঠে, 'নমঃ পার্বতী পতয়ে, হর হর মহাদেব।' ■

পরিষদ বার্তা

স্বামী বিবেকানন্দ শৌর্য প্রশিক্ষণ শিবির

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত

'সেবা, সুরক্ষা ও সংস্কার'—এই ত্রিবিধ আদর্শকে ধারণ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব-আয়াম বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে সপ্তম দিবসীয় স্বামী বিবেকানন্দ শৌর্য প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভ সূচনা সম্পন্ন হল। খড়্গপুরের পবিত্র গোপালী আশ্রমে ভারত মাতা, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রজী ও শ্রীহনুমানজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, দ্বীপ প্রজ্জ্বলন এবং মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে শিবিরের শুভ উদ্বোধন করা হয়। দেশ, ধর্ম ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ যুবশক্তিকে সুসংগঠিত ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই শৌর্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীগৌতম কুমার সরকার মহাশয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং কলকাতা ক্ষেত্রের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা প্রমুখ। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মার্গদর্শন করার জন্য কেন্দ্রীয় সহ সংগঠন সম্পাদক শ্রীবিনায়ক দেশপাণ্ডে, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্রীসোহন সিং সোলাঙ্কি, প্রান্ত সহ সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, প্রান্ত সম্পাদক শ্রীচন্দ্রনাথ দাস এবং প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক শ্রীমানিকচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বজরঙ্গ দলের কার্যকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী এবং বিপুল সংখ্যক (২১০) যুব প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সমারোপের সময় বজরঙ্গ দলের সদস্যরা তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রদর্শন করে দেখান। সমারোপের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক বসন্তকুমার পুষ্পী এবং অধ্যাপক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। সমারোপ ভাষণ দেন ক্ষেত্র সম্পাদক শ্রীঅমিয় সরকার মহাশয়।

প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের অভ্যাস বর্গ

তিন দিবসীয় বনবাসী রক্ষা পরিবার ফাউন্ডেশন-এর প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের অভ্যাস বর্গ। উত্তর বীরভূম জেলার খরমাডাঙ্গা গ্রামে বিশ্বমঙ্গল আশ্রমে শুরু হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রিয় সম্পাদক মাননীয় অমিয় কুমার সরকার, উত্তর বীরভূম জেলার জেলা সম্পাদক মাননীয় শান্তনু হাজরা বজরং সংযোজক মাননীয় সুরজিৎ বিশ্বাস বনবাসী রক্ষা পরিবার ফাউন্ডেশন এর তিন বঙ্গের সংযোজক মাননীয় রতন চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সংযোজক ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থার বর্ষীয়ান কার্যকর্তা মাননীয় রাম অবতার সাহু মহাশয়, এছাড়া স্থানীয় কার্যকর্তাগণ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অখণ্ড বীরভূম জেলার ১২৫ জন প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের আচার্য এই অভ্যাস বর্গে অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর বীরভূম জেলা।

বর্ষপ্রতিপদ ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

সরোজ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাছে বর্ষপ্রতিপদ দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা সরসঙ্ঘচালক ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৮৮৯ সালের এই বর্ষপ্রতিপদ নাগপুরে এক বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৫০০ বছরের দাসত্বের ফলে যে হিন্দু জাতি তার গৌরবময় সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ইতিহাসকে ভুলতে বসেছিল পারস্পারিক কলহের কারণে, বিদেশিদের প্রভু রূপে স্বীকার করেছিল, সেই জাতিকে তিনি একত্রিত করার জন্য ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেবল মন্ত্রই দিলেন না —সংগঠনের মন্ত্রস্বরূপ শাখা পদ্ধতির প্রণয়নও করলেন।

প্রাচীনকালে ভারতীয়দের পৌরুষ, রাজ্য, স্বাধীনতা, সম্পদ প্রভৃতি সব কিছুই ছিল, কিন্তু একাত্মতা, পরিপূর্ণ স্নেহ ও অনুশাসন যুক্ত সংগঠনের অভাবেই ভারতবাসী শৃঙ্খলিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ডাক্তারজি তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণে। ভারতমাতার সেবা করার জন্য তিনি কৈশোরে চিরকৌমার্য ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন সেই প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর স্কুল জীবনেই। স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি তার সহপাঠীদের সংগঠিত করে 'বন্দেমাতরম্ ধ্বনি' উচ্চারণ করেছিলেন ইংরেজি পরিদর্শকের সামনে। দক্ষ সংগঠকের মতো তিনি এই ধ্বনি দিয়ে সকল ছাত্রের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের কাজে সফল হয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম্ ধ্বনি' তোলার জন্য শাস্তি হিসেবে পরবর্তীতে তিনি স্কুল থেকে বহিস্কৃত হন।

ডাক্তারজি উপলব্ধি করেছিলেন যে একে অপরের যখন হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়, তখন তা থেকে এক অমোঘ শক্তি সৃষ্টি হয়। তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝেছিলেন মানুষের মনে ত্যাগের বীজ বপন করতে পারলে সেই মানুষ দ্বারা অপর একজনের অন্তরকরণেও একইভাবে ত্যাগরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করা সম্ভব। এবং এই ভাবেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রত্যয়ী লক্ষ লক্ষ দেশ প্রেমিকের সংগঠন গড়ে উঠবে। ডাক্তারজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছোট-বড় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের সক্রিয় রেখেছিলেন। স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বদা দেশমাতৃকার প্রতি সমর্পিত ছিলেন। যারা বলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন ভূমিকাই পালন করেননি, তারা এই মহান দেশপ্রেমিকের কর্মধারা না জেনেই মন্তব্য করেন।

কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বাংলা থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন সংগঠন শাস্ত্রের 'বর্ণপরিচয়'। সেই কারণেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। পড়াশোনা করার অছিলায় তিনি কলকাতায় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করার সুবাদে এবং বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ থাকার কারণে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন।

কেশব হেডগেওয়ার অত্যন্ত গরিব পরিবারের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। কারোর কাছ থেকে হাতপাতার রুচি তাঁর ছিল না। থাকা-খাওয়া স্বাচ্ছন্দ্য কেশবজীর জীবন কখনো আসেনি। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সমস্যাকে আনন্দের সঙ্গে সমাধান করতেন। ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক হয়ে গিয়েছিলেন। 'কোকেন' ছদ্মনামে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলত।

দামোদরের বন্যার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তিনি সেবা কাজেও গিয়েছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন যুবক কেশবের সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠনকে জহুরির চোখ দিয়ে দেখেছিলেন তিনি। এরপর ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন তিনি তৈরি করলেন সংগঠন শাস্ত্রের অনবদ্য গ্রন্থ 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ'।

জাতির জীবনে চরম হতাশা নিরাশার সময় যুব পুরুষের জন্ম হয় এবং যিনি ওই সমাজকে সঠিক দিশা নির্দেশ করেন, তেমনই একজন ছিলেন ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ডাক্তারি হিন্দুজাতির অতীত গৌরবের পাশাপাশি দীর্ঘ পরাধীনতার কারণগুলো খুঁজে বের করে হিন্দুদের মধ্যে স্বাভিমান ও আত্মশক্তিকে জাগানোর কাজ করেছিলেন। 'ভারত হিন্দু রাষ্ট্র' এবং হিন্দুস্তান হিন্দুদেরই একথা বলার ও উপলব্ধি করানোর জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন তিনি। এই জাগরণ শক্তিই পারে ভারতবর্ষকে 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' এনে দিতে। ■

ফলহারিণী কালীপুজো : নারী শক্তির উৎস

রবিব্রত ঘোষ

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ফলহারিণী কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই কালীপুজো একেবারেই বাংলার লোকায়ত ধারার সঙ্গে যুক্ত। দেবীর ফলহারিণী রূপের কোনও পৌরাণিক কাহিনি আমরা পাই না। পুরাণে এই দেবীর কোনও বিশেষ রূপবর্ণনার দেখাও পাওয়া যায় না। তবু বাংলায় এই রূপে দেবী পূজিতা হন। পুজো পদ্ধতি অনুসরণ করলে বোঝা যায়, এইদিনের পুজোয় কোনও বিশেষ পুজো পদ্ধতির কথা বলা নেই। সাধারণত দক্ষিণাকালী যে মন্ত্রে ও যে আচারে পূজিতা হন, ঠিক সেই আচারে ও মন্ত্রে ফলহারিণী কালিকা পুজো সম্পন্ন করা হয়। তবু পৃথক একটি আচার আছে, সেটিকে বিশেষ আচারও বলা যেতে পারে। এই পুজোর সময় দেবীকে নানারকম ফল দান করতে হয়। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে, 'জ্যৈষ্ঠ-পঞ্চদশ্যাং বহুফলাদ্যুপহারৈঃ পূজনীয়া'; অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় সাধক নানাবিধ ফলের উপহার সহযোগে দেবীর পুজো করবেন। আবার অন্য একটি বিধানে ক্রিয়াকাণ্ড বারিধিতে বলা হয়েছে, 'জ্যৈষ্ঠে মাসি তথামায়াং সফলং কালিকার্চনম; জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় বিশেষভাবে নানাবিধ ফল দিয়ে কালিকাদেবীর পূজা করতে হয়।' এ-প্রসঙ্গে মায়াতন্ত্রের সতেরো পর্বে আরও স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, জ্যৈষ্ঠ মাসি অমায়াং বৈ মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি। পূজয়েত কালিকাং দেবীং নানাদ্রব্যোপহারকৈঃ।।' অর্থাৎ, জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথির মহানিশায় সাধক নানা দ্রব্যের উপহার সহযোগে শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর জ্যৈষ্ঠ করবেন।

বাঙালি জীবনে ফলহারিণী কালী পুজোর তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দিনেই নিজের স্ত্রী সারদা দেবীকে পুজো করেছিলেন জগৎ কল্যাণের জন্য। ১২৮০ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাশক্তি সগুণরূপের পুজো করেছিলেন। তিনি ফলহারিণী কালী পুজোর দিন শ্রীমা সারদাকে ষোড়শীরূপে পুজো করেছিলেন বলে আজও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং এই মতের অনুসারী আশ্রমে এই পুজো 'ষোড়শী' পুজো নামে পরিচিত।

ঐদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেও কালীপুজো হয়েছিল। এই উৎসবের মধ্যেই প্রায় একান্ত গোপনে এই ঐতিহাসিক পুজোটি সংঘটিত হয়েছিল লোক গোচবের বাইরে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ তার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এই অংশটি বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত। মা সারদার জীবনের উপর যারা আলোকপাত করেছেন, তাদেরও লেখায় এই ঘটনার বিবিধ বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মা সারদার সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য মহারাজের শ্রীশ্রীসারদাদেবী গ্রন্থটি। আমরা এখানে অক্ষয় চৈতন্য মহারাজ কি বলছেন সেটা একটু দেখে নেব 'ঠাকুর অন্তরের এক অপূর্ব প্রেরণায় চালিত হইয়া নিজের ঘরে জগন্মাতার বিশেষ পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় ও দীনু পূজারীর সাহায্যে দেবীর রহস্যপূজার সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করিতে করিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

পূজার পূর্বকৃত্যসকল দর্শন করিতে করিতে মা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন; এবং ঠাকুরের ইঙ্গিতে, পূর্বমুখে উপবিষ্ট পূজকের দক্ষিণভাগে আলিম্পনভূষিত পীঠে উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূত হইা সর্বকল্যাণ সাধন কর!'

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাস পূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন।

সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

পূর্বপূর্ব সাধনকালে ব্যবহৃত বস্ত্র, আভরণ ও রুদ্রাক্ষের মালাদি সমুদয় দ্রব্য, সেই সকল সাধনার ফল এবং নিজেকে দেবী পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন।

এই ঘটনার একাধিক তাৎপর্য আছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন রকম কারণে যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে হবে। ভারতীয় শাস্ত্রে পিতা-মাতা বা গুরুজনেরা সন্তানের কাছে চিরকালই প্রণম্য। গুরুকে রীতিমতো পুজো করা হচ্ছে এরকম উদাহরণ প্রাচীন ভারতে পাওয়া যাবে। অনেক মাতৃভক্ত মাকে দেবীর জায়গায় বসে পুজো করছেন সেটাও পাওয়া যাবে। কিন্তু কেউ নিজের স্ত্রীকে ইষ্ট দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করছেন, এরকম ঘটনা পাওয়া যাবে না এমনকি পুজোকেন্দ্রিক উপাসনা পদ্ধতিগুলোতেও এমন উদাহরণ নেই।

কোন কোন উপাসনা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে সাধন সঙ্গিনী হিসেবে ব্যবহার করার একটা ধারা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে স্ত্রীকে ইষ্টদেবী জ্ঞানে পুজো করার অনেক পার্থক্য আছে। সাধন সঙ্গিনীর ধারণায় স্ত্রী স্বামী বা সাধকের সহযোগী মাত্র। কার্যত সাধন সঙ্গিনী বলা হলেও স্ত্রী কার্যত এখানে সাধকের সাধনার উপকরণ মাত্র। এই ঘরানায় স্ত্রী স্বামীর কাছে পূজাযোগ্য তো ছিলেনই না এমনকি সামান্যতম শ্রদ্ধার যোগ্যও ছিলেন না। অবশ্য সকল নারীর মূর্তির মধ্যেই সাধককে অনুপ্রেরণা দেওয়া হতো নিজের ইষ্ট দেবীকে অনুভব করার।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘরানার সাধক ছিলেন না। প্রাথমিক পর্যায়ে উনি মূলত দক্ষিণা কালীর পূজা করেছেন। ভগবানের প্রতি তীব্র ভালবাসা আত্মবিসর্জন থেকে পাওয়া সাধনা লব্ধ জ্ঞান থেকে উনি ভারতীয় ধর্মের শাশ্বত চিন্তাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। সব নারীর মূর্তির মধ্যেই ইষ্ট দেবী রয়েছেন। মা সারদা একবার ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে তোমার কে বলে মনে হয়? উনি উত্তর দিয়েছিলেন যে শরীরের জন্ম দিয়েছেন অর্থাৎ কিনা নিজের জননী, যিনি মন্দিরে আছেন অর্থাৎ কিনা যিনি ইষ্ট দেবী এবং যিনি এখন ওনাকে সেবা করছেন অর্থাৎ নিজের স্ত্রী সব একই রূপেরই বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। সকল জীবের মধ্যেই মাতৃমূর্তিকে অনুভব করাটা ভারতীয় সাধনার একটা উল্লেখযোগ্য ধারা। সেই ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক আগেই উচ্চ স্তরে পৌঁছে চূড়ান্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

বাকি ছিল যে স্ত্রীর মধ্যে নিজের ইষ্ট দেবীকে অনুভব করিয়ে তার মধ্যেও দেবীত্বকে ফুটিয়ে তোলা।

পুজো শুরুর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা সেই ধারণাকে সমর্থন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা করছেন—

'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!'

সনাতন ধর্ম মতে পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য পূজা করতে করতে পুজক আর মানব থাকেন না। তিনি ধীরে ধীরে যাবতীয় অশুদ্ধতা দূর করে শুদ্ধ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন, তখন তার মধ্যে দেবতার বিকাশ ও আগমন হয়। অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও যুগান্তকারী এই পুজোয় আমরা দেখব পূজক এবং পূজিতা দুজনের মধ্যেই ঈশ্বরীয় আবেশের সৃষ্টি হবে।

স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, 'সে ভূমিতে আত্মসংস্থ পূজক ও পূজিতা আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে একীভূত হইলেন। পূজা শেষ হল। ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে সুপ্ত দেবীত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করলেন সেদিন। পূজা শেষে নহবতের ঘরে ফেরার সময় শ্রীশ্রীমায়ের মনে হল ঠাকুর তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। সে প্রণাম তিনি ফিরিয়ে দেননি। তিনি ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করলেন এবং নহবতে ফিরে এলেন।

মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।'

সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তৎকালীন সময় ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। নারীরা মূলত একটি সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। রামমোহন বিদ্যাসাগরের হাত দিয়ে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য পুরুষের কাছে নারীদের শিক্ষা দেওয়ার পিছনে কারণটা ছিল উন্নতমানের শয্যাসঙ্গিনী পাওয়া যাবে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজের স্ত্রীকে পূজা করাটা অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা। পূর্বে অর্জিত যাবতীয় সাধনার ফল সেই দিন সেই রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের স্ত্রী শ্রীমা সারদা দেবীর পদপ্রান্তে অর্পণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার পরিসমাপ্তি হয়েছিল একজন নারী পদপ্রান্তে।

বিবেকানন্দের ভব আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও এই ঘটনাটি দিকনির্দেশ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এবং বিবেকানন্দ প্রচারিত বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে শিব জ্ঞানে জীব সেবার কথা। বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় কবিতায় বারবার বলেছেন মানুষ দেবতা ছাড়া কিছু না। এক নারী মূর্তির মধ্যে দেবতার আবাহন করে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ধারণারই শুভ সূচনা করেছিলেন।

ভারতের ধর্মের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। নারীদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবী ভক্তমণ্ডলিকে দেখার জন্য মা সারদাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে যা ছিল ভীষণ রকমের ব্যতিক্রমী এক কাজ। মা সারদা পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘ জননী ছিলেন। এমনকি বিশ্ব বিখ্যাত বিবেকানন্দ ও তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়তেন মাতৃ কৃপা লাভের জন্য।

সন্ন্যাসীদের কাছে মায়ের কথা ছিল শেষ কথা। যাবতীয় বিবাদের মধ্যে মায়ের কথাই ছিল শিরোধার্য আদেশ। আপাত নিরক্ষর, অত্যন্ত লজ্জাশীলা মা সারদা আপন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়েই সদ্যোজাত শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘকে পরিচালনা করে গেছেন।

কালীপুজোর দিনে ষোড়শী পূজার মধ্যে দিয়ে মা সারদার মধ্যে শুধু নারীত্বের যে উদ্বোধন হয়েছিল তা নয়, প্রচলিত সমাজ মতের বাইরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বোধন করতে পেরেছিলেন এক নারী শক্তিকে। সূচনা করেছিলেন এক ভাবী সংঘের, যেখানে একজন নারীর হাত ধরে একটা সংঘ চলবে, নতুন নারী শক্তির উদয় হবে। ■

ওঙ্কার : হিন্দুত্বের মূল মন্ত্র

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

হিন্দুদের উচিত শাস্ত্ররূপী মায়াজাল থেকে বেরিয়ে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ছেড়ে একটি শাস্ত্রকে ধরে রাখা, যা হল প্রণব মন্ত্র বা ওঙ্কার। বহু শাস্ত্রের আপাত বিরোধ সনাতন-হিন্দু সমাজের ঐক্যের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু শাস্ত্র বলছে ধর্মের মূল হচ্ছে বেদ, বেদের মূল হচ্ছে গায়ত্রী, আর গায়ত্রীর মূল হচ্ছে প্রণব মন্ত্র বা ওঙ্কার। তন্ত্র,পুরাণ, আগম, স্মৃতি, সূত্র, সংহিতা বা লোকমত এদের কোনটাই এ কথার প্রতিবাদ করে না। সুতরাং সমস্ত আপাত বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য প্রাণপাত না করে, এই প্রণব মন্ত্র তথা ওঙ্কার-কেই একমাত্র উপজীব্য বলে গ্রহণ করা উচিত। হিন্দুদের এই মন্ত্রেরই আপ্রাণ সাধনা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। কারণ হিন্দু জাতিকে এক ছাতার তলে আনতে হলে এই ওঙ্কার এর দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রতিটি মার্গেই এই ওঙ্কার বা প্রণব মন্ত্রকেই মূল তথা আদি মন্ত্র-রূপে গণ্য করা হয়। ঈশ্বরের বোধক তথা মুখ্য নাম 'ওম্' বা প্রণব। ঈশ্বরের বাকি সমস্ত নাম গৌণ।

সাধনার মূল লক্ষ হল জড়ত্ব অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে চেতনাত্ব অবস্থা লাভ করা। এই কাজে বেদ ও ঋষিগণ ওঙ্কার ('ওম্') সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

'ওম্' এই শব্দ ব্রহ্মবাচক, পরমেশ্বরের সর্বোচ্চ নাম। এখানে অ, উ, ম—এই তিন অক্ষর মিলে এক 'ওম্' হয়েছে; এই একটি নাম থেকেই পরমেশ্বরের অনেক নাম সূচিত হয়। অ-কার থেকে বিরাট অগ্নি ও বিশ্ব; উ-কার থেকে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, তৈজস; আর ম-কার থেকে ঈশ্বর, আদিত্য, প্রাজ্ঞ ইত্যাদি পরমাত্মার গুণরূপ বুঝিয়ে দেয়।

যজুর্বেদের এক মন্ত্র এই ধারণাকে স্পষ্ট করে :

ওম্ খং ব্রহ্ম (যজুর্বেদ ৪০/১৭)

এখানে 'ওম্' রক্ষাকর্তা, 'খং' সব কিছুকে ব্যাপ করা আকাশের মতো, আর 'ব্রহ্ম' সব থেকে বড় ও মহোত্তম সত্তা, এই তিনটি শব্দ মিলিয়ে পরমেশ্বরের একই স্বরূপকে বোধ করায়।

মৃত্যুকালেও এই মন্ত্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে :

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওতম্ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর।।

(যজুর্বেদ ৪০/১৫)

অনুবাদ : হে কর্মশীল জীব, শরীর ত্যাগের মুহূর্তে পরমাত্মার নাম 'ওম্' স্মরণ কর। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রাণ সমূহ সহ অমৃত স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও। তারপর এই ভৌতিক শরীর ভস্মে পরিণত হোক।

উপনিষদগুলোতেও ওঙ্কারকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে

উল্লেখ করা হয়েছে। কঠোপনিষদ বলে :

সর্বে বেদা যৎ পদমামনমি্ত তপাংসি সর্বাণি চ যদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি, ওমিত্যেতৎ।। (কঠ-১/২/১৫)

এই 'ওম্'-ই সেই পরম পদ, যাকে বেদ সব কিছু দ্বারা, সকল তপস্যা দ্বারা এবং যোগীরা ব্রহ্মচর্য দ্বারা সাধনা করে থাকেন। পর মন্ত্রে বলা হয়েছে :

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।
(কঠ-১/২/১৬)

এই অর্থ হল, এই 'ওম্' নাশশূন্য, সর্বোত্তম ও পরম অক্ষর ব্রহ্ম; এই অক্ষরকে জেনে যে কিছু চায়, তাই প্রাপ্ত হয়। আর এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়ে বলা হয়েছে :

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
(কঠ-১/২/১৭)

এই বাক্য বলে, ব্রহ্মজ্ঞানের সকল উপায়ের মধ্যে ওঙ্কারের ধ্বনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পরম; একে জানলে ব্রহ্মলোকে উন্নতি লাভ করা যায়।

মুণ্ডক উপনিষদ এই ভাবনাকে আর এক মন্ত্রে ফুটিয়ে তোলে :

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্। (মুণ্ডকোঃ উপঃ ২/২/৬)

অর্থাৎ, 'ওম্' এই শব্দ অবলম্বন করে পরমাত্মাকে ধ্যান কর। এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওম্ শুধু উচ্চারণ নয়, ধ্যানেরও মূল বীজ।

যোগদর্শনে পতঞ্জলি ঈশ্বরের নাম হিসেবে 'ওম্দ'-এর কথা বলেছেন :

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (যোগ-সূত্র ১/২৭)

এর অর্থ : ঈশ্বরের বোধক নাম 'ওম্' বা প্রণব। এরপরের সূত্র বলে :

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ (যোগ-সূত্র ১/২৮)

—এখানে বলা হয়েছে, ওম্ শব্দের জপ করা উচিত এবং এই নামের নামী ঈশ্বরের রক্ষণ-পালন প্রভৃতি গুণের চিন্তন করা উচিত। এইভাবে মন একাগ্র হয় এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়।

গীতাতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবনাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

ওম্ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরামাম্ গতিম্।।
(গীতা ৮/১৩)

এর অনুবাদ : যে পুরুষ 'ওম্' নামক এক অক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করে, তাঁর পরম গতি লাভ হয়। এভাবে শুদ্ধ চিত্তে সকল লোভ ত্যাগ করে ওঙ্কার উপাসনা করলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব; এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ওঙ্কারের পুনরায় ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়। যজুর্বেদের ৩১/১৮ মন্ত্র বলে, তাঁকে জানলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়; এই পরম পদ লাভের দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে :

যশ্চন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ ছন্দোভ্যোধ্যমৃতাৎ সম্বভূব।
স মেন্দ্রো মেধয় স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্।
শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিব্বা মে মধুমত্তমা।
কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কেশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ শ্রুতং মে গোপায়।
আবহন্তী বিতন্বানা (তৈত্তিরীয় উপঃ ১/৪/১)

এখানে ওঙ্কারকে 'বেদসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বরূপ ও অমৃততত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে; এই ওঙ্কাররূপ পরমেশ্বরের কাছেই বুদ্ধি, শরীর, জিহ্বা, কর্ণ ও শ্রবণলব্ধ জ্ঞানের কল্যাণ কামনা করা হয়েছে।

সারাংশে বলা যায়, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, যোগশাস্ত্র ও ভগবদ্গীতায় একমাত্র প্রণব মন্ত্র বা ওঙ্কারকেই পরম ব্রহ্মের প্রতীক ও সর্বোচ্চ সাধনার পথ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর অ, উ, ম অক্ষরের মাধ্যমে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের রহস্য উন্মোচিত হয় এবং জড়ত্ব থেকে চেতনার দিকে যাত্রা সম্ভব হয়। বহু শাস্ত্রের আপাত বিরোধ দূর করে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সব মতের মূলে ওঙ্কারকে অবলম্বন করলে হিন্দু জাতি এক ছাতার তলে আসতে পারে। এর জপ, ধ্যান ও স্মরণের মাধ্যমে মৃত্যুকালেও পরম গতি লাভ সম্ভব, যা সকল তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই একমাত্র মন্ত্রের আপ্রাণ সাধনাই হিন্দুত্বের প্রকৃত মূল মন্ত্র।

সুতরাং, সনাতন সমাজের প্রত্যেকের উচিত বহুত্ববাদ ত্যাগ করে ওঙ্কারকে একমাত্র আশ্রয় করে জীবনের চরম মুক্তি ও ঐক্যের পথে অগ্রসর হওয়া। এটিই হিন্দুত্বের অটুট ভিত্তি, যা সকল বিরোধের সমাধান ও পরমাত্ম প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ■

সনাতন সংস্কার 'অম্বুবাচী' : শব্দজ শিকড়-সন্ধান

শ্যামলচন্দ্র দাস

জল এমন এক প্রাকৃতিক উপাদান, যা যে কোন জীবজগৎ ও প্রাণীজগতের পক্ষে আবশ্যিক ও অপরিহার্য। কারণ গাছপালা, চারাগাছ, ছোটখাটো আগাছাও যেমন জল গ্রহণ করে জীবন্ত থাকে, তেমনি মনুষ্যেতর প্রাণীজগতের ক্ষেত্রেও তা অপরিহার্য ও গ্রহণীয়। একটা সুস্থ স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীর গঠনেও জলের ভূমিকা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক নারী শরীরে পেশী ও চর্বি বেশি হয় বলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের তুলনায় শতকরা পাঁচ ভাগ জল অনেক সময় কম হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের তুলনায় শিশুদের শরীরে জলের ভাগ একটু বেশিই হয়। অর্থাৎ জল ও জীবন একে অপরে আষ্টেপৃষ্ঠে বিজড়িত। একটি সুনির্দিষ্ট সময় জীব বা প্রাণীসত্তা জল ছাড়া কাটাতে পারলেও একটা সময়ের পর জলপান জরুরি হয়ে পড়ে, অন্তত জীবন রক্ষার তাগিদে। নইলে নানা শারীরিক ক্ষয় ও মুমূর্ষ অবস্থা শুরু হতে বাধ্য। এই জল আবার শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য, শরীর-জাত বর্জ্য রক্ত-জল বের করার জন্য, রক্তের সুস্থতা, স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য, হৃদপিণ্ড ও কিডনির সচলতার জন্য, আরও নানা অভ্যন্তরীণ শারীরিক কারণে জরুরী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বেঁচে থাকতে গেলে জলই জীবন—জলের অপর নাম জীবন।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে, ঋগ্বেদের নারদীয় সূক্ত তথা বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে নিখিল বিশ্ব ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও জলের নিচে ছিল। সেই আদিম জল বা সলিল থেকেই পরম ব্রহ্ম বা সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন উৎপাদিত হয়। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হল জল। হিন্দুধর্মের লোকবিশ্বাস অনুসারে এই জলকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ, পবিত্রতা, নিরাময় এবং আত্মিক জাগরণের এক অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া এটি মহাজাগতিক শক্তির ধারক, সৃষ্টির আদি উৎসও বটে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে জল থেকে সমস্ত জীবনের উৎপত্তি। শুধু তাই নয়, এতে বিদ্যমান দিব্য নিরাময় শক্তি, শারীরিক ও মানসিক পাপমুক্তি, এমনকি মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তিও ঘটে অস্থি-কলস বিসর্জনের মাধ্যমে, অন্তত তেমনই অধিকাংশ হিন্দুর লোকবিশ্বাস।

যাই হোক, এই জলের অনেক নামান্তর রয়েছে—বারি, পানি, সলিল, অম্বু ইত্যাদি। জলবাচক একাধিক শব্দের মতো অম্বুও সংস্কৃত শব্দ। এই অম্বু শব্দের সঙ্গে আরও নানা অংশ যুক্ত হয়ে একাধিক শব্দ গঠিত হয়ে থাকে, যেমন অম্বুজ (জলে জাত, যথা পদ্ম, শঙ্খ) অম্বুদা (জল দেয় যে, মেঘ), অম্বুবাহী (অম্বু বহন করে যে, মেঘ), অম্বুজা (পদ্মিনী, লক্ষ্মী), অম্বুর বা অম্বর (আকাশ) অম্বুধি বা অম্বুনিধি (সমুদ্র), অম্বুচারী বা অম্বুবাসী (জলচর), অম্বুবিম্ব (জলের বুদবুদ), অম্বুধারা, অম্বুরাশি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নিরম্বু শব্দ প্রচলিত উপবাসের ক্ষেত্রে।

অবশ্য, অম্ব বা অম্বু ইত্যাদি অপ্ বা উদকের সমগোত্রীয়। কিন্তু অম্বু শব্দের গঠন তুলনায় একটু অন্যরকম। এই গঠনের ভেতরে রয়েছে নানাবিধ তাৎপর্য ও অর্থগত মাত্রা। দৃশ্যমান অ-ম-ব-উ বর্ণ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে অম্বু শব্দ। আমরা যদি ব-কে বাদ দিয়ে অ উ ম বর্ণ ধরি তাহলে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি বা জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা বা বিকাশ ও সুষুপ্তি অবস্থা বোঝায়। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের কারও কারও রজঃচক্রের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই অবস্থা লক্ষ করা যেতে পারে, অন্তত সুষুপ্তি, বিকাশ ও জাগ্রত অবস্থা।

আবার মহাবিশ্বের আদি ধ্বনি-বীজ উল্লিখিত তিনটি বর্ণ প্রতীক। রজঃচক্রেও সৃষ্টি, বিনষ্টের পর পুনরায় সৃষ্টি সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে। আবার অ উ ম-এর মাঝখানে রয়েছে ব বর্ণ। তা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তথা অ, উ ও ম-এর মাঝে রয়েছে, যা আসলে বায়ু (পবন দেব) তথা বারি দেবতা বরুণের প্রতীক বর্ণ। সূচক বর্ণগুলো লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। প-বর্গের ধ্বনি উচ্চারণের সাথেও বায়ুর একটা সম্পর্ক রয়েছে। 'বা' শব্দের অর্থও বায়ু। এই বর্গের ধ্বনি উচ্চারণ তার প্রমাণ। যাইহোক, বায়ুর সাথে মেঘ বা জল সম্পর্কিত। বারি ও বায়ু বা বাতাস দুটোতেই থাকে সজীব প্রাণের নিহিত উপাদান। কারণ O_2 বা অক্সিজেন আমাদের প্রাণের অস্তিত্বকে সচল রাখে। অর্থাৎ বায়ু মানেই অক্সিজেন জাত জীবনীশক্তি তথা জীবনপ্রবাহ। জলেও রয়েছে সেই অক্সিজেনাদি জৈবনিক উপাদান, যা জলচর প্রাণীরা গ্রহণ করে।

বস্তুত ব মানে বিন্দু বা সৃষ্টির মূল হেতু। বীজ-বিন্দুও বলা যেতে পারে। নারী ও পৃথিবী তথা ধরিত্রী ঋতুমতী হলে সৃষ্টির বীজ তৈরি হতে পারে। চ বর্ণ আত্মিক জগতের কেন্দ্র,

যা থেকে প্রাণের বীজ সমুৎপাদিত হতে পারে। জগদ্ধিতায় তথা জগতের কল্যাণ-মঙ্গলে অক্ষরটি 'চিৎ' বা চেতনা শক্তি (সুপ্ত আত্মিক শক্তি)-র প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, যা বিশ্বচরাচরে সজীব প্রাণের সঞ্চার করে। ধরিত্রী বা পৃথিবী এক্ষেত্রে প্রকৃতি তথা নারী হিসেবে গণ্য। পুরুষ সেক্ষেত্রে আকাশ। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত হলে জলের বৃদ্ধি তথা বর্ষণ হয়ে থাকে প্রাকৃতিকভাবে। আবার রজঃচক্রের নিয়ম অনুসারে বছরে একবার তিন-চারদিন ধরে মাতৃরূপা ধরিত্রী ঋতুমতী হন (উল্লেখ্য যে বরাহমিহিরের বৃহজ্জাতক-এ অম্বুগুচার)। মর্ত্য জগতের সামাজিক প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক নারীদের ক্ষেত্রে অবশ্য মাসিক রজঃচক্র প্রযোজ্য। এই সময় মাটিতে যেমন কৃষি কাজ বা আঘাত নিষিদ্ধ, তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রেও ঋতুমতী হলে তাদের শারীরিক ব্যথা-যন্ত্রণার কারণে যত্ন-আত্তিতে রাখতে হয়। অন্যদিক থেকে দেখলে, চ বর্ণের রয়েছে ঘর্ষণের ভাব। যথা—চণ্ডইংরেজি টিএস/সি (স্পর্শ, তালব্য, উষ্ম-ঘৃষ্ট), যে বর্ণ উচ্চারণের সময় তালুতে স্পর্শ করলে ঘর্ষণ উৎপাদিত হয়ে শ্বাসবায়ুর প্রলম্বন ঘটে। যেমন 'মোচড় বা মোচড়ানো, খামচানো' শব্দে যেমন ব্যথা যন্ত্রণা নিহিত রয়েছে, তেমনি রজঃস্রাবেও এই মোচড়ানো-র নিহিত ব্যথা লক্ষণীয়। কারণ এই ব্যথার শেষে সৃষ্টির বীজ তথা ডিম্বস্ফুটনের সূচনা হয়ে থাকে। দেখা যায় গ্রীষ্মের দাবদাহ পেরিয়ে গেলে বর্ষার আগমন হওয়ার সময় পৃথিবীও সিক্ত হয় এবং বীজ বপনের যোগ্য হয়ে ওঠে, আর এই ধরনের কাজের যোগ্য হয়ে ওঠার সময় ৬ই বা ৭ই আষাঢ় থেকে ১০ই বা ১১ই আষাঢ় ধরিত্রী মাকে অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য করে বিব্রত করা হয় না। বাস্তবিক ভারতীয় সমাজে নারীদেরকেও এই ধরনের সময়কালে অনুরূপ বিব্রত করতে হয় না, অন্তত ২৮ দিন বা এক মাস অন্তর ৩-৪ দিন সময় কাল। আবার ধরিত্রীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করাও নিষিদ্ধ করা হয় এই সময়। অনেক অনেক পরিবারে সেজন্য আমোতি বা আমতির দিনে বাসি খাবার খাওয়াই প্রচলিত নিয়ম। তবে ফলাহারও অনেক সময় করা হয়ে থাকে। কিন্তু অগ্নিপক্ক খাবার সেসময় হিন্দু বিধবারা সাধারণত গ্রহণ করে না। কোনও কোনও পরিবারও এই ধরনের খাবার খেয়ে থাকে।

অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ব্যবহৃত জলকে অম্বু বলে। তুলনীয় তর্পণ। তর্পণে জলাঞ্জলি বা অর্ঘ্য-জলও একপ্রকার অম্বুই। বাচী অর্থ প্রকাশ বা আভা, প্রভা। দেব-দেবীর স্নানজল (লৌকিক ভাষায় 'চাঁনজল') আমরা সনাতনীরা অনেকেই মন্দিরস্থ দেবার্ঘ্য জল কোশাকুশি থেকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে থাকি, যা ভক্তের ভেতরে শান্তির আভা বিকশিত করে।

অন্যদিক থেকে বাচী হল বৃদ্ধি, উৎফুলন। অমাবতী বা রজোৎসবে রজঃস্থানের উৎফুলন ঘটে, জলের বৃদ্ধি হয়। সেজন্য নারীবাচক দেবী মন্দিরগুলোতে সে-সময় পুরুষ প্রবেশ নিষেধ হয়ে থাকে। যেমন কামাখ্যা মন্দির, আসাম। ভারতে বেশিরভাগ (অন্তত নয়—দশটি) ভগবতী মন্দিরে পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ, যেমন আট্টুকাল ভগবতী মন্দির (কেরলম), দেবী কন্যাকুমারী ভগবতী মন্দির, চাক্কুলাথুকাভু মন্দির (কেরলম) ইত্যাদি। ব্রহ্মা মন্দির (পুষ্কর, রাজস্থান)-এও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ। উল্টোটাও রয়েছে। শবরীমালা আয়াপ্পা মন্দিরের কথা আমরা অনেকেই জানি, আয়াপ্পা দেব যেহেতু কৌমার্যব্রতী ব্রহ্মচারী, সেজন্য ঋতুমতী মহিলারা সেখানে প্রবেশ করতে পারত না। যদিও ২০২৬ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। রণকপুর জৈন মন্দির (রাজস্থান), ভগবান কার্তিকেয় মন্দির (পুষ্কর)-এ ঋতুমতী মহিলারা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সন্ন্যাসীদের মন্দির মাউন্ট এথোস (গ্রীস), মাউন্ট ওমিন (জাপান)-এও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এই ধরনের বিধি নিষেধ বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত, এমনকি দেবদেবীর পূজার ক্ষেত্রেও লিঙ্গভেদ আজও রক্ষিত হয়ে থাকে সংস্কারবশত। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে লৈঙ্গিক সংস্পর্শ অনেক সময় যৌনাঙ্গের অম্বুক্ষরণ বৃদ্ধি করতে পারে, এই সংস্কার আজও অনেক দেব-দেবীর স্থানের ক্ষেত্রে মান্যতা পায়।

অন্যদিক থেকে বাচী শব্দের অর্থ প্রস্ফুটিত হওয়া বা প্রবাহিত হওয়া। অম্বুবাচী শব্দে রয়েছে দুটি ব। এই ব (ইংরেজি বি বর্ণ) একদিকে স্ত্রী-লিঙ্গবাচক নীতিকে ইঙ্গিত করে, যাতে আন্তঃসম্ভাবনার উন্নয়ন ও শক্তি লালিত হয়। আবার ব হচ্ছে স্বর্গীয় ভাবনার ভিত্তি, ঘর, আধার, যাতে আধ্যাত্মিক চেতনা লালিত-পালিত হয় (ছটি ঐশ্বর্য বাদ দিলেও বলা যায়—ভগবান শব্দের অর্থ হল ভূমি, গগন, বায়ু, অগ্নি, নীর)। 'ভগবান'-এর ব-তে এই ধরনের ধারণা যেমন নিহিত রয়েছে, রয়েছে জলের ধারণা, তেমনি প্রথম অংশে নিহিত রয়েছে স্ত্রী যৌনাঙ্গ বাচক অর্থের আভাস। শুধু তাই নয়, ব বর্ণের আকারও অনেকটা স্ত্রী-যোনি সদৃশ। আবার অ হল ভ্রৌণ ভাবের বীজ। বর্ণ বা অক্ষর সূচক অভিব্যক্তির প্রথম স্ফূরণও।

এই অ যখন উ পর্যন্ত প্রবাহিত হয় তখন সৃষ্টি-মন্ত্র

থেকে সংরক্ষা-মন্ত্র পর্যন্ত সম্প্রসারণ ঘটে। আর আ-তে গিয়ে তার সম্প্রসারণ হয়। ম-তে কিছুটা স্তব্ধতায় ঝিমিয়ে গিয়ে পুনর্জাগরণ বা পুনরভ্যুদয় ঘটে। অ হচ্ছে সর্জন, উ হচ্ছে পালন, ম হল স্থির ভাবে থেমে গিয়ে আবারও প্রত্যাবর্তন। যা ঋতুচক্রে লক্ষণীয়।

অন্যদিক থেকে ভাবলে ম হল ঐতিহাসিক ভাবে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত, জীবন, প্রক্ষোভ ইত্যাদির প্রবাহকেও উপস্থাপন করে। ইংরেজি 'এম' বর্ণও তাই। অ-নির্ভর ধাতু জাত 'অন্' আসলে চল বা সচলতা আভাসিত করে।

ধীর কিন্তু অবিরাম চলমানতা বা উন্নতির প্রতীক এই চ। এটি সাধারণত গ্রহণ, আপ্যায়ন, চপলতার ব্যঞ্জক। চ-বর্গের সঙ্গে রয়েছে তরল পদার্থের সম্পর্ক, এমনকি তারল্যও। মোটকথা, ঋতুচক্রের সাথে বর্ণগুলোর সম্পর্ক নিহিত রয়েছে।

যাইহোক, আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে উচ্চারণ করলে তিন ধরনের রূপ পাওয়া যায়—সংবৃত, বিবৃত ও তীর্যক। ঋতু আরম্ভ হওয়ার আগে স্ত্রী যৌনাঙ্গ সাধারণত স্বল্প হলেও সংবৃত থাকে। ঋতুকালীন অবস্থায় অল্প হলেও বিবৃত হয়ে যায়। অতঃপর ৩-৪ দিন পরে পূর্বাবস্থায় স্থিত হয়। অন্যভাবে ভাবলে আ ধ্বনি উচ্চারণের সময় 'বদন ব্যাদান করিয়া হা করিয়া থাকি'...মুখের গর্তের 'পরিসর ও বিস্তার যথাশক্তি' (ধ্বনি-বিচার) বাড়িয়ে নিই। দীর্ঘ ঈ উচ্চারণেও ওষ্ঠ ও অধর দুইপাশে প্রলম্বিত হতে থাকে। উচ্চারণে মুখ-কোটর আরও ছোট হয়; দুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে, দুই ঠোঁটের মাঝে একটি ছোট বিবর উৎপন্ন হয়; ওই বিবরের দুয়ার দিয়ে হাওয়া বাহির হয়' (ধ্বনি-বিচার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। ঋতুমতীর ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি তিনটির উচ্চারণের অনেকখানি সাদৃশ্য আমরা পেতে পারি। হাওয়া বাহির হওয়ার পরিবর্তে ঋতুস্রাব নির্গমন এক্ষেত্রে স্মরণীয় ও তুলনীয় হতে পারে।

আবার গোটা শব্দ ধরে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়। শব্দে স্বরধ্বনির আধিক্য কোমল ভাবের বিস্তার ঘটায়। অম্বুবাচী শব্দের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যায়—অ উ আ ঈ—এই চারটে স্বরধ্বনি বা স্বরবর্ণ শব্দটিতে রয়েছে। ম যেহেতু নাসিক্য ধ্বনি, তাই তা 'কঠোরকে মৃদু করে, কঠিনকে মোলায়েম করে।'

ম ধ্বনির ক্ষেত্রেও রয়েছে কোমলতা। আর চ কোমলতার আভাস দেয়।

আবার অম্বুবাচী শব্দের অক্ষর গঠন লক্ষ করলে অম্-বু-বা-চী। অম্ (ওম্) উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ ও অধর বন্ধ হয়ে গিয়ে মুখের গর্ত ছোট হয়ে যায় (বু হল আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় 'দুর্গন্ধ'। রজঃস্রাব-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্গন্ধ অনেক সময় নিষ্কাশিত হতে পারে)। বু বলার সময় ওষ্ঠাধর সংকুচিত হয়ে সামান্য একটু খোলা থাকে, তার মাঝখান দিয়ে হাওয়া বেরোয়। বা বলতে গেলে মুখের গর্ত সামান্য খোলারূপ ধারণ করে। অতঃপর চী উচ্চারণ করার সময় ওষ্ঠাধর দুই পাশে সম্প্রসারিত হয়ে আধখোলা থাকে। আবার নাসিক্য ম বলতে গেলে নাসা-রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করে। বর্গীয় ব উচ্চারণের ক্ষেত্রে ওষ্ঠাধর ও মুখের গর্তকে খোলা অবস্থায় রেখে হাওয়া বে'র করতে হয়। মুখের ভেতরের গর্ত ও নাসা-রন্ধ্রকে নালীর মতো করে যে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা এই শব্দের উক্ত ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় করা হয়, তা অনেকটা স্ত্রী যৌনাঙ্গের নালীর ভেতর দিয়ে রজঃস্রাব নিষ্কাশনের সমগোত্রীয়।

শব্দের বর্ণ, অক্ষর ইত্যাদি ভিত্তি বাদ দিলেও আলোচিত উৎসবের সঙ্গে জড়িত আরও দুটি শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক।

স্বভাব বা প্রবণতা, মনের অন্তর্নিহিত ভাব, আচরণ, বা মানসিকতা বোঝাতে বৃত্তি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

যদিও সাধারণভাবে প্রবৃত্তি হল পাওয়ার বা ভোগের পথ, যাতে রয়েছে বহির্মুখী হওয়া, জাগতিক কাজে লিপ্ত হওয়া, বাসনা পূরণের প্রবণতা। অন্যদিকে নিবৃত্তি হল ছাড়ার বা ত্যাগের পথ, যাতে রয়েছে অন্তর্মুখী হওয়া, জাগতিক মোহ থেকে দূরে থাকা, বিরতি। এই ধরনের মানসিকতা সকল জাগতিক মানুষের থাকে না। বিগত প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রকৃতি লক্ষ করলে ধান্দাবাজি, নিজের স্বার্থ গোছানো, একাধিক দুর্নীতিকে আশ্রয় করে অর্থ সঞ্চয়, অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন ইত্যাদি আমরা লক্ষ করেছি। যদিও বর্তমান সরকার ভালো কিছু করবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা। চলমান সরকারের শুরুটা তো ভালোই হয়েছে। উঠন্তি মুলোর পত্তনেই চেনা যায়। বাকিটা আগামী বলবে। যাইহোক, অম্বুবাচীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যথাক্রমে শুরু ও শেষ বোঝাতে এক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে।

এইভাবে লক্ষ করলে বলা যেতে পারে যে বাস্তব সমাজের মহিলা শ্রেণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রজঃচক্র, ধরিত্রী মায়ের জন্য নির্ধারিত দৈবী উৎসব, কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে যোনিজ রজঃচক্রের জন্য পালিত উৎসব ইত্যাদি 'অম্বুবাচী' শব্দের অন্তর্নিহিত গঠনে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ■

সোমনাথ মন্দির আমাদের পরম্পরার অখণ্ডতার প্রতীক

আদিত্য দেব

শ্রীসোমনাথ মন্দির ভগবান শিবের বারোটি (১২) জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। বেদ, পুরাণ এবং অন্য ধর্মগ্রন্থে সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা আছে। এই স্থানে চন্দ্রমার তপস্যা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে শিব প্রকট হয়েছিলেন। চন্দ্রমা ভগবান শিবের কাছে বরদান চান, তিনি যেন এই শিবলিঙ্গকে তাঁর নাম প্রদান করেন। চন্দ্রমার আরেক নাম সোম, এই কারণে ভগবান শিব এখানে সোমনাথের নামে বিরাজমান আছেন। ধর্মগ্রন্থ অনুসারে সবার প্রথমে চন্দ্রমা এখানে কেবল সোনার মন্দির নির্মাণ করে দিব্য লিঙ্গের স্থাপনা করেন। পরবর্তী সময়ে সৌরাষ্ট্রের রাজারা এই মন্দির ভব্যতায় কোন রকমের খামতি রাখেননি। তখন এই মন্দিরে সোনা, রুপা, হীরা, মতি, পান্না এবং অন্যান্য রত্ন দিয়ে স্তম্ভগুলোকে সাজানো হয়েছিল, যা প্রদীপ প্রজ্জলনের সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল করে উঠতো। মন্দিরের এই বৈভবের কারণেই বিদেশি আক্রান্তরা লুট করার জন্য বারংবার আসত। মোট ১৭ বার এই মন্দিরকে লুট করা হয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে লেখা আছে, 'প্রভাসংচ পরিক্রমা পৃথিবীক্রম সংম্ভবম' অর্থাৎ দিব্য প্রভাস (সোমনাথ)-এর পরিক্রমা সম্পূর্ণ পৃথিবীর পরিক্রমার সমান। যখন দেশের মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে দর্শন পূজার জন্য আসেন, তখন তাদের এই সভ্যতার অদ্ভুত নিরন্তরতার অনুভব হয়। সোমনাথ কেবল একটি মন্দির নয়, আমাদের সভ্যতার অটুট সংকল্পের নিদর্শন। এই মন্দিরের সামনে বিশাল সমুদ্রের ঢেউ অনন্তকালের অনুভূতি করায়। এর ঢেউ আমাদের শিক্ষা দেয়, যে ঝড় যতই ভয়ানক হোক না কেন, মানুষের আত্মবল তাঁকে প্রত্যেক বার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলে। মানবীয় চেতনাকে অনেক দীর্ঘ সময় চাপা রাখা সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাম্রাজ্যই এসেছে এবং গেছে, নানা রকম পরিবর্তন পরিবর্ধনের পরেও সোমনাথ আমাদের হৃদয়ের সর্বদাই বিরাজিত আছে।

লোকুলিশ এবং সোমশর্মার মতন মনীষীরা 'প্রভাস'কে শৈব দর্শনের মহান কেন্দ্র বানিয়েছেন। চক্রবর্তী মহারাজ ধারসেন চতুর্থ অনেকদিন আগে সেখানে দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করেন। সময়ের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ভীম প্রথম, জয়পাল এবং আনন্দ পালের মতন শাসক বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে মন্দিরকে রক্ষা করেন। মান্যতা আছে, মহান রাজা ভোজ এই পাবন স্থলের পূর্ণনির্মাণের জন্য নিজের অমূল্য যোগদান দিয়েছিলেন। কর্ণদেব সোলাঙ্কি এবং জয় সিংহ সিদ্ধরাজ গুজরাটের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তির পুনঃস্থাপনের জন্য মুখ্য ভুমিকা নির্বাহ করেছিলেন। এছাড়া ডাউ বৃহস্পতি, কুমার পাল সোলাঙ্কি এবং পশুপতাচার্য এই তীর্থকে জ্ঞান ও আরাধনার কেন্দ্র রূপে স্থাপিত করার জন্য অমূল্য যোগদান দিয়েছিলেন। বিশালদেও বাঘেলা এবং ত্রিপুরান্তক এর বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক পরম্পরা রক্ষা করেন। মহীপাল চুড়াসমা এবং রাও খংগার চুড়াসমা বিধংশের পর পূজা পাঠের পরম্পরাকে পুনর্জীবিত করেন। পুণ্যশ্লোকা মাতা অহিল্লাবাঈ হোলকার সেই চরম পরিস্থিতিতেও ভক্তির পরম্পরাকে জীবিত রেখেছিলেন। বড়োদার গায়েকওয়ার পরিবার তীর্থযাত্রীদের অধিকারের রক্ষা করেছিলেন। এছাড়াও আমাদের এই ধরণী বীর হামীর গোহিল, বীর বেগডাজি ভীলের মতন পরাক্রমী যোদ্ধাদের বলিদানে ধন্য হয়েছে।

১৯৪০-এর দশকে স্বাধীনতা অর্জনের ঢেউ সম্পূর্ণ ভারতে যৌবনে ছিল। সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ ভারতের রাজ-রাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন ভারত নির্মাণের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সরদার প্যাটেলের মন একটি দুঃখ ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করতেই হবে। ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দীপাবলীর দিনে সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে জল হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ অবশ্যই করা হবে। এই আহ্বান কেবলমাত্র গুজরাটকে নয় সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে উৎসাহে ভরে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরদার প্যাটেল সোমনাথের দ্বার উদঘাটন দেখে যেতে পারেননি। উনার এই বিজনকে নবানগরের জাম সাহেবের সমর্থনে কেএম মুন্সী সম্পন্ন করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে আমন্ত্রণ করা হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর বিরোধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মন্দির উদঘাটন করতে আসেন। ১১ই মে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন, 'সোমনাথ মন্দির দুনিয়াকে এই বার্তা দেয়, যে অদ্বিতীয় শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসকে কখনো নষ্ট করা যায় না। আশা করি এই মন্দির সর্বদাই মানুষের হৃদয় বাস করবে।' তিনি আরো বলেন, সরদার প্যাটেলের স্বপ্ন সাকার হয়েছে, আজ সরদার সাহেবের ভাবনার অনুযায়ী মানুষের জীবনের সমৃদ্ধি আনতে হবে।

৩১শে অক্টোবর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্র মোদিজি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন সোমনাথ মন্দির নির্মাণে ৫০তম বৎসর পালন করা হয় এবং সরদার প্যাটেলের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডওয়ানী উপস্থিত ছিলেন। আবার ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের ৭৫তম বছর পালন করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির উপস্থিতিতে। গত ১০ বছরে সরদার প্যাটেলের অনুপ্রেরণাতে নরেন্দ্র মোদি সরকার—সোমনাথ থেকে কাশি বিশ্বনাথ, কামাখ্যা থেকে কেদারনাথ, অযোধ্যা থেকে উজ্জয়িনী, ত্রিবেঙ্কেশ্বর থেকে শ্রীশৈলম পর্যন্ত আমাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক সুখ-সুবিধা দ্বারা সুসজ্জিত করে তুলেছে এবং যানবাহন চলাচলের মাধ্যমে যুক্ত করেছেন। এর ফলে সড়কপথ, জলপথ, রেলপথ, আকাশপথ দ্বারা লাখ লাখ মানুষ এখানে দর্শনের জন্য আসতে পারছেন এবং স্থানীয় অর্থ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন, পবিত্র সোমনাথ ধাম দর্শন করার জন্য। সেখানে চির বিজয়ের দর্শনকে অনুভব হবে, যা ভারতবর্ষে সনাতনী শক্তির উৎস এবং পরম্পরার অখণ্ড প্রতীক। ■

পরিষদ বার্তা

হিন্দু নাবালক হত্যাকাণ্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক শ্রীবজরংলাল বাগরা গাজিয়াবাদের খোড়ায় অমর বালক সূর্য চৌহানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং গভীরতম সমবেদনা প্রকাশ করেন। বকরি ইদের দিনে এক নিরীহ নাবালক হিন্দু বালককে নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু একটি পরিবারের ওপরই নয়, সমগ্র সমাজের বিবেকের ওপরও এক আঘাত। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি প্রত্যেক সংবেদনশীল ব্যক্তিকে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ করেছে। বাগরাজি শোকাহত মা ও পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। ঘটনার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এই ধরনের জঘন্য অপরাধের জন্য শুধুমাত্র দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারই ভুক্তভোগীর পরিবারকে প্রকৃত সমর্থন জোগাতে পারে। সমাজ প্রত্যাশা করে যে এই অমানবিক কাজের অপরাধীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাস্তি দেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোন নিরীহ শিশু এমন নিষ্ঠুরতার শিকার না হয়।

পরিষদ প্রশিক্ষণ বর্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত

গত ১৭ই মে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত পরিষদ প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয় খড়্গপুর গোপালী আশ্রমে। মোট ১৫১ জন শিক্ষার্থী (১১৪ জন পুরুষ, ৪৫ জন মহিলা) ১০ দিন ধরে প্রশিক্ষণলাভ করেন। কেন্দ্রীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক বিনায়ক রাও দীক্ষিত, সহ-মন্ত্রী অশোকজী, সহ-মন্ত্রী শ্রীস্বপন মুখার্জী, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্রীসোহন সিং সোলাঙ্কি, ক্ষেত্র সম্পাদক শ্রীঅমিয় সরকার, প্রান্ত সভাপতি সুবীর সান্যাল, কার্যকরী সভাপতি শ্রীঅজয় গোয়েল, প্রান্ত সহ-সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, ক্ষেত্র সেবা প্রমুখ শ্রীসুধাংশু পাত্র, প্রান্ত দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা সুশ্রী পারমিতা পাল প্রভৃতি মহানুভবরা ওই বর্গে উপস্থিত হয়ে মার্গদর্শন করান। প্রান্ত সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রতীপরঞ্জন মজুমদার শিবির আধিকারিকের দায়িত্বে ছিলেন। প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক শ্রীমানিকচন্দ্র পাল পূর্ণ সময় দিয়ে শিবিরকে সফল করেন।

ত্রিপুরাতে অর্চক পুরোহিত সম্মেলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশ টেম্পল অর্চক পুরোহিত আয়াম আনন্দময়ী আশ্রমে রাজ্যের প্রায় ৬৫ জন বিশিষ্ট পুরোহিতের একটি একদিনের সমাবেশের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ড. দীনেশ তিওয়ারি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আঞ্চলিক সংগঠন মন্ত্রী) এবং প্রদেশের সভাপতি শ্রীশচীন কালাই, প্রদেশের সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রায়, প্রদেশ সংগঠন মন্ত্রী শশীকান্ত পাণ্ডে, টেম্পল অর্চক পুরোহিত আয়মের প্রধান শ্রীমতী শিবলী চক্রবর্তী, প্রবীণ কর্মী শ্রীজগদীশ গণ চৌধুরী এবং প্রদেশ জেলার অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈচারিক বিষ থেকে মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষের উপর শাসন শুরু করেছিল, তখন কলকাতা শহরকে প্রথম রাজধানী বানিয়েছিল। শাসন কাজ চালানোর জন্য তখনকার বাঙালি ভদ্রলোককে বৈচারিক হিসেবে চাপলুশবাবু বানিয়ে ছিল। ওঁনারা সমাজকে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ সৃষ্টি করে চরমভাবে বিভক্ত করেছিল। এমনকি তথাকথিত হিন্দু ভদ্রলোকদের স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে বিরত করে বিপ্লবীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পর্যন্ত সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজরা খ্রিস্টান মিশনারীদের উৎসাহ প্রদান করে ধর্মান্তরণের কাজকে তীব্র গতি দান করেছিল। ভারতীয়দের ভাবমূর্তি সাঁপুড়ে এবং জঙ্গলবাসি বলে প্রচার করেছিল। বিদেশিরা আমাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে নষ্ট করার জন্য মেকেলের দ্বারা রচিত ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপিয়ে, গুরুকুল প্রথাকে সমাপ্ত করে দেয়। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্র করে কৃত্রিম আকাল তৈরি করে বাংলায় ৩০ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয়।

এত কিছু হওয়ার পরেও বাংলার মানুষকে শেষ করতে পারেনি ব্রিটিশ শাসন। এই ধরিত্রী থেকে আধ্যাত্মিক গুরুদের আহ্বানে বিপ্লবীরা সেই সনাতনী বিরোধী ইংরেজ শাসনকে উপড়ে দেওয়ার জন্য ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রকে মুক্তির মন্ত্র করে তুলেছিল বিপ্লবীরা। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের একমাত্র আরাধ্য হবে কেবল 'ভারত মাতা', যা স্বীকার করে হাজার হাজার নর-নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুদিরাম বোস, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ আরো অনেক যুবক-যুবতীরা মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল দেশমাতার মুক্তির জন্য। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' নির্মাণ করে যুদ্ধ করে ভারতের এক বিশাল অঞ্চলকে স্বাধীন করিয়েছিলেন। ওঁনার ভয়ে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বাংলার মানুষ কখনো বিদেশি ভাবধরার সঙ্গে আপোষ করেননি। কট্টরপন্থী মুসলিম শাসন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি, এমনকি বামপন্থীদের অরাজকতা অত্যাচারের পরেও বাঙালির বাড়ি থেকে দুর্গা পুজো, মা কালীর পুজো প্রভৃতি বিভিন্ন সনাতনী আচার অনুষ্ঠান রুখতে পারেননি। আজও বাঙালি ঘরে ঘরে মা দুর্গা তাঁর পূর্ণ বৈভব নিয়ে বিরাজিত আছেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলার মাটিতে সনাতনী বিচারধারায় বিশ্বাসী হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং কৃষক প্রজা পার্টির (কে.পি.পি) এ.কে ফজলুল হকের যৌথ সরকার শাসনে এসেছিল। কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায়, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ডাইরেক্ট একশন ডে (Direct Action Day)-তে, জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ দ্বারা হিন্দুদের গণহত্যা এড়ানো যায়নি। বাংলার বিভাজন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) হতে দেখেছি আমরা। এরপর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস থেকে বামপন্থী, তারপর তৃণমূলদের শাসনে আমরা দেখেছি হিন্দুত্বের বিচারধারার উপর চরম আঘাত এবং অত্যাচার। স্বাধীনতার পর থেকেই প্রশাসনের মানুষদের, পুলিশদের, বিচার ব্যবস্থাকে, একটাই কথা শেখানো হয়েছিল, 'হিন্দুত্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখো। হিন্দুত্ব একটি বিষবৃক্ষ, একে বাড়তে দেওয়া যাবে না। যারা হিন্দুত্ব নিয়ে কথা বলেন তারা এক রকমের অস্পৃশ্য'। এই ধরনের নির্দেশের ফলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আদালতে শপথ পত্র দিয়ে বলেছিলেন, 'তারা হিন্দু না', যাতে সরকার দ্বারা তারা শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের আটকাবার জন্য সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য, জমি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি সীমান্ত রক্ষাকারীদের সামান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত দেয়নি পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেসের (T.M.C) সরকার।

অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল এই পশ্চিমবঙ্গ। সনাতনী পুজো-পার্বণ, দুর্গাপূজার বিসর্জন, বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ সংখ্যালঘুদের তোষণ করার জন্য তাজিয়া মহরম, বকরি ঈদ, গোহত্যা করার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না

টিএমসি সরকারের। এই ধরনের পৃষ্ঠভূমিতে স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সম্পূর্ণ সনাতনী বিচারধারার রাজনৈতিক দল হিসেবে বি.জে.পি-কে নির্বাচিত করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিয়ে এসেছ, তা কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংকল্প ও সাধনারই ফল।

বাংলায় হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের প্রয়াস ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। আর.এস.এস-এর ঋষি তুল্য প্রচারকদের বাংলার মাটিতে কাজ করার জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নির্মিত রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসংঘের আধুনিক স্বরূপ ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। আর.এস.এস-এর শুরুর সময় প্রচারকদের মধ্যে প্রয়াত কেশবরাও দীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণ মোতলক, সঞ্জয় নন্দী, বসন্তরাও ভট্ট, গজানন্দ বাপড়, রামচন্দ্র সহস্ত্র-ভোজনী, অনন্তলাল সোনি, ধর্মচাঁদ নাহার, বংশীলাল সোনী, দীনেন দে, সুকুমার পাত্র, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল প্রামাণিক, শ্রীবালকৃষ্ণ নায়ক (কেষ্টদা), শ্যামলাল ব্যানার্জি, অমল কুমার বসু, শ্যামমোহন দে, সুধাময় দত্ত, কালীশঙ্কর চক্রবর্তী, সরোজকুমার মণ্ডল, লক্ষীকান্ত সেন, রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক, বিদ্যুৎ দত্ত প্রভৃতিদের নাম না করলে বাংলায় সংঘের ইতিহাস পূর্ণ রূপে জানা যাবে না। এছাড়া প্রাতঃস্মরণীয় বালাসাব দেওরস, কে.এস সুদর্শনজী, ভাউরাও দেওরসজি প্রভৃতি দিগ্গজ নেতৃত্বরা বাংলার মাটিতে সনাতনীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য তাদের রক্ত-জল এক করে দিয়েছিলেন। আর.এস.এস-এর স্বয়ং সেবকরা সংঘের আদর্শে প্রেরিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান দিয়েছেন এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সংঘ, সংস্কার-ভারতী, বিদ্যাভারতী, ভারতীয় কিষাণ সংঘ, ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল, ভারত বিকাশ পরিষদ, অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ, ক্রীড়া ভারতী, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ প্রভৃতি সংগঠন তাদের সামাজিক কাজ দ্বারা হিন্দুত্বকে জাগ্রত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মেহনতি মারওয়ারী সমাজ, অন্যান্য হিন্দিভাষী সমাজের মানুষদের সনাতনীর জাগরণের ভূমিকাকেও আমাদের জানা দরকার যাঁরা এই রাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। যদিও বামপন্থী লিবারেল বর্গের মানুষ দ্বারা ওঁদের উপর অত্যাচার এবং অন্যায় করা হয়েছিল। সেই কারণে বিভিন্ন বড় শিল্পগোষ্ঠী তাদের ব্যবসাকে অন্য প্রদেশে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এক সময়ের সমৃদ্ধ পাট শিল্প কারখানাগুলি আজ বিলুপ্তির পথে চলে গেছে। হোসিয়ারী শিল্প পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ওঁদের আর্থিক মদত যুগ যুগ ধরে হিন্দুত্বের জন্য খোলা ছিল। এমনকি ওদের বাড়ি গাড়ি সবই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের জন্য উপলব্ধ থাকে। পূজ্য সর-সংঘচক শ্রীগুরুজী, বালাসাহেবজি, রাজেন্দ্র সিংজি, সুদর্শনজি এমনকি মোহন ভাগবতজি তথা অটলজি আডবাণীজি, মুরলী মনোহর জোশিজি, নানাজী দেশমুখ প্রমুখ মহানুভবদের কলকাতার বাসস্থান এই হিন্দিভাষী সমাজই প্রায় দিয়ে থাকত। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের জাগরণের জন্য বিভিন্ন অজ্ঞাত হিন্দিবাসী সমাজের ভূমিকা আমাদের মনে রাখা উচিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘ চালক শ্রীগুরুজী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে ভারতের প্রথম হিন্দুত্ববাদী পার্টি, ভারতীয় জনসংঘের সংস্থাপক সভাপতি নির্বাচিত করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং শ্রীদুর্গাচরণ ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গ থেকে জনসংঘের নির্বাচিত সংসদ ছিলেন। বাংলার বীর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের একতা এবং কাশ্মীরের পূর্ণ বিলয়ের জন্য প্রাণের আহুতি দেন। সেই পার্টির আধুনিক রূপ বি.জে.পি এইবার ২০২৬-এর নির্বাচনে ২০৭ বিধায়কদের শক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী সরকার গড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মিত বাধাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। এই বিজয় হিন্দুত্বের শক্তির জয়ের দ্বিতীয় কীর্তিস্তম্ভ। প্রথম—৫০০ বছর পরে অযোধ্যায় রামমন্দিরের নির্মাণ এবং দ্বিতীয়—স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সনাতনী সরকারের প্রতিষ্ঠা।

বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে তৃণমূলের সরকারকে উপড়ে ফেলেছে, তার ফল তৃণমূলের নেত্রীকে বিচলিত করে দিয়েছে। তিনি নিজে হেরে যাবার পরেও বলেছেন, তিনি হারেননি এবং মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। যাইহোক ভারতীয় সংবিধান অনুসারে

রাজ্যপাল ওঁনার সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায়, ওঁনাকে বরখাস্ত করে নতুন সরকার গঠনের আদেশ দেওয়ায়, বিজেপির সরকার গত ৪ঠা মে শপথ গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার চালাচ্ছেন। কলকাতা থেকে সুদূর গ্রামীণ এলাকার মানুষ নির্বাচনের ফলাফল আসার পর যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছে, তা প্রমাণ করে জনসাধারণ কতটা টিএমসি সরকারের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল। এই নির্বাচনের পরিনাম যেন মুক্তি দিবস রূপে এসেছে। কেবল রাজনৈতিক কার্যকর্তারা না, সাধারণ মানুষও মুক্তির উৎসবে মেতে উঠেছিল সেই দিন।

২০১১-এর নির্বাচনের পর মৃত্যুর তাণ্ডব দেখেছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু ২০২৬-এর নির্বাচনের পর তা হতে দেয়নি বি.জে.পি সরকার। বাংলার মানুষ কাটমানি, তোলাবাজি, ধর্ষণ, মহিলা নির্যাতন, মুসলিম তুষ্টিকরণ, সনাতন ধর্ম পালনে বাধা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেয়েছে। যেন এই বিষবৃক্ষ সমূলে নষ্ট হয় এবং নতুন সন্ত্রাসমুক্ত, ব্যবসা-বাণিজ্যযুক্ত, গুণ্ডাকালচার মুক্ত, রোজগার সৃজনযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের নির্মাণ শুরু হয়, এটাই আপামর জনসাধারণ চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছিল রোজগার সৃজন কেন্দ্র, বহু মানুষ এই প্রদেশে এসে সমৃদ্ধিশালী হতেন। কিন্তু দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে শিল্পের পলায়ন বাংলাকে উন্নতির পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান সরকারের কাছে মানুষের চাহিদা একটাই, ডাবল ইঞ্জিন দিয়ে প্রগতির রেলযাত্রাকে তার সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া। যে মুক্তি আজ বাংলার মানুষ অনুভব করছে, তা যদি বজায় থাকে তাহলেই মানুষের সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়ে যাবে। বাকি অর্ধেক কাজ, শিল্প জগত, শাসনে বিশ্বাস জন্মালেই করে দেবে বলে বিশ্বাস করি। ■

যোগাভ্যাসের জ্ঞান ভারতবর্ষ দিয়েছে সমগ্র বিশ্বকে

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

যখনই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরম্পরা, সাংস্কৃতিক গভীরতা এবং জীবন দর্শনের চর্চা হয় তখন যোগ তার এক অমূল্যবান প্রতীক রূপে সামনে আসে। এটি কেবল কিছু আসন, প্রাণায়াম কিংবা মুদ্রাগুলো পর্যন্ত সীমিত থাকে না বরং এমন একটা জীবনশৈলীকে দর্শায় যা শরীর, মন এবং আত্মাকে সন্তুলিত করা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রাচীন কাল থেকে ভারতের মুনি-ঋষি দ্বারা যোগ সাধনার পরম্পরা চলে আসছে। আদি-অনন্তকাল ধরে পতঞ্জলি যোগসূত্রের কথা আমরা সকলেই জানি। সেখানে যোগকে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যতাকে রুখবার পদ্ধতি বলা হয়েছে। যোগের উল্লেখ সবার আগে ঋগ্বেদ এবং উপনিষদে পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষই যোগের আবিষ্কারক এবং যোগ শিক্ষা সনাতন ধর্মের অঙ্গ রূপে সমাজের আত্মিক ধারায় পরিণত হয়েছে। কালান্তরে এই বিদ্যা কখনো বৌদ্ধ, কখনো জৈন, কখনো নাথ যোগীদের কিংবা হঠ যোগীদের মাধ্যমে আগে এগিয়েছে।

আধুনিক যুগে যোগ সাধনাকে বিশ্বে পরিচয় ঘটিয়ে উচ্চস্থানে অনেক বিভূতিরা নিয়ে গেছেন। যেমন—১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলোকে পরিচয় করিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে পরমহংস যোগানন্দ, বি.কে.এস অয়ঙ্গার, বাবা রামদেব, শ্রীশ্রীরবি শঙ্কর, সদগুরু জগ্গী বাসুদেব প্রভৃতি যোগকে ঘরে ঘরে এবং দেশে দেশে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু এইসব প্রয়াসের সংগঠিত রূপে সারা বিশ্বের কাছে খ্যাতি ও মান্যতা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত হয়েছিল, যখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদিজি সংযুক্ত রাষ্ট্র মহাসভায় ২১শে জুনকে 'আন্তর্জাতিক যোগদিবস' রূপে পালন করার প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবটি ১৭৭টি দেশের সমর্থনে পাশ হয় এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২১শে জুনকে সমগ্র পৃথিবীতে যোগদিবস রূপে পালন করা শুরু হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে ২১শে জুনকেই কেন এই যোগ দিবস বলে স্থির করা হল? কারণ ২১শে জুন বছরে সবথেকে বেশি দীর্ঘ দিন এবং সূর্যের উর্জার প্রতীক ভাবা হয়। ভারতের পরম্পরায় সূর্যকে জীবিত চেতনা ও আত্মবলের স্রোত মানা হয়। যোগের মাধ্যমে সূর্য নমস্কার এই শ্রদ্ধার প্রতিবিম্ব। সুতরাং এই দিনটি কেবলমাত্র ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকেই না বরং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতেও সর্বশ্রেষ্ঠ।

আধুনিক জীবনধারা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক

প্রভাব ফেলেছে। অনিদ্রা, মানসিক দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশন, উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, স্থূলতা ইত্যাদি জীবনশৈলীকে রোগের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করার পরেও রোগ নিরাময় হচ্ছে না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে। সেখানে যোগ সাধনা বিনাব্যয়ে, সহজ ও সুলভ উপায় রূপে মানুষের সামনে এসেছে। অনেক অধ্যায়নে প্রমাণিত হয়েছে, নিয়মিত যোগ সাধনা যাঁরা করেন, তাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, মানসিক স্থিরতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সকারাত্মক দৃষ্টিকোণের বিকাশ ঘটে। আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, দুবাই ইউ.এ.ই প্রভৃতি দেশগুলো যোগকে মনোচিকিৎসার এবং টেনশন দূর করার চিকিৎসা রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, আমেরিকার প্রায় ৪ কোটি মানুষ নিয়মিত যোগ করে থাকেন। বিশ্বে যোগের মার্কেট ভ্যালু ১৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ ভারতে আজও এটি বিনামূল্যে উপলব্ধ আছে। ভারত সরকার 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' এবং 'আয়ুষ মন্ত্রণালয়ে'র মাধ্যমে যোগকে জনে জনে পৌঁছানোর প্রয়াস করছে। যোগ কেবলমাত্র ২১শে জুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, দৈনিক শরীরচর্চার মধ্যে রাখা দরকার।

যোগ সাধনার গুরুত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত গীতাতেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী, পন্ডিত এবং ধার্মিক ব্যক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। 'অতএব হে অর্জুন যোগী হও' শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি এই উপদেশ প্রমাণ করে যে, যোগ হল আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ পথ। যোগ সাধনার সাহায্যে শরীর ও মন নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করা যায়। যোগের সাহায্যে আধ্যাত্মিক সাধনা এবং মোক্ষ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। যোগ হল ভারতীয় প্রাচীন পরম্পরার অমূল্য উপহার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের; মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং তার সৃষ্টিকর্তার একাত্মতা অনুভব হয়। ঠিকভাবে যোগ অভ্যাস করতে পারলে আমরা শরীরের অভ্যন্তরীণ রসায়নের পরিবর্তন মেটাতে পারি এবং এটি এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় যে, আমরা যে কোন অবস্থায় সর্বদা শান্তিতে থাকতে পারি।

বিদেশে কিছু যোগ প্রতিষ্ঠান মেডিকেল চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে 'যোগ থেরাপি সার্টিফিকেট কোর্স' করাচ্ছে। আজকাল কর্পোরেট বিশ্বে বিশেষ করে প্রযুক্তি বিভাগের কর্মচারীদের সুস্থতার কর্মসূচিতে যোগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সুপ্রাচীন যোগ বিদ্যাকে বিশেষ করে মর্যাদা দিয়ে স্কুল, কলেজের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস জারি রেখেছে। এমনকি যোগের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান নির্মাণ করার প্রতি সরকার প্রয়াস করে চলেছে। সুতরাং যোগাভ্যাস কেবল শরীর-মন-স্বাস্থ্যকেই সংরক্ষিত করবে তা নয়, বরং রোজগার সৃজনও করবে। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে যোগকে নিত্য জীবনশৈলীতে নিয়ে আসি। ■

দুর্গা বাহিনীর সৎসঙ্গ, বারাসাত, দক্ষিণবঙ্গ

উষা রাম মানব কল্যাণ আশ্রম কমিটির সাধারণ সভা
পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

ধর্ম পরিবর্তন : বিভিন্ন পন্থা থেকে সাবধান

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

ধর্ম পরিবর্তনের সমস্যা অর্থাৎ হিন্দুস্তান এবং হিন্দু ধর্মের উপর অনেক শতাব্দী ধরে বিধর্মীদের দ্বারা আক্রমণের ইতিহাস আমরা কম-বেশি সকলেই জানি। আরব দেশ থেকে এবং ইংরেজদের দ্বারা অনেক বৈদেশিক আক্রমণ ভারতের উপর হয়েছে, যার উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার, তেমনি আরেক দিকে ছিল নিজেদের ধর্মের প্রসার ও বিস্তার। বিধর্মীরা নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য প্রতারণা, ছল-বল-কৌশল, প্রলোভন কিংবা অনৈতিক কাজকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করেনি। 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'তে বলা হয়েছে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্ম ভয়াবহঃ'। অর্থাৎ স্বধর্মের পালন করার জন্য যদি মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবুও পরধর্ম স্বীকার না করাই শ্রেষ্ঠ।

বাস্তবে এক ধর্মকে ত্যাগ করে দীক্ষাপূর্বক অন্য ধর্ম স্বীকার করাকে ধর্ম পরিবর্তন বলা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র পরধর্মের অধ্যায়ন, মিশ্র বিবাহ অথবা নিষিদ্ধ মাংস সেবন করলেই ধর্ম পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বিবিধ প্রলোভন, অত্যাচার, ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগ করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তন করানোকে কখনো ধর্ম পরিবর্তন বলে ভাবা উচিত না। খ্রিস্টান ধর্মের স্থাপনার পরে ৫২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মপোদেশ ফাদার সেন্ট থমাস ভারতবর্ষের কেরালা প্রান্তে আসে এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার আরম্ভ করে।

কিন্তু ইসলামিক শাসনকালে হিন্দুদের সর্বাধিক ধর্ম পরিবর্তন হয়েছিল। সেই সময় কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে ধর্ম পরিবর্তন সব থেকে বেশি হয়েছিল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ কাশেম সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে বলপূর্বক ধর্মান্তর করিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে নানারকম পথ অবলম্বন করে ধর্মান্তর করা হয়েছিল। তার বর্ণনা তারিখ অনুসারে 'মা-আমীর-ই-আলমগীর' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল, Rayol Asiatic Society দ্বারা।

দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতান ক্ষমতায় আসার পরই ঘোষণা করে, 'সব কাফিরদের মুসলিম বানাবো। স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত না হয়, তাহলে ধর্ষণ করো, হত্যা করো, কিন্তু যে করেই হোক মুসলিম বানাতেই হবে'। মালবারে এক লাখ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে টিপু। কর্ণাটকে একদিনেই পঞ্চাশ হাজার হিন্দুদের মুসলিম বানিয়েছিল। ইসলামের প্রচার এবং বিস্তার করার জন্য, তুর্কিস্তানের খালিফা, টিপুকে 'সুলতান' এবং 'গাজী' উপাধি দিয়েছিল। 'History of Sufism in India' নামক পুস্তকে সুফি ফকিরদের, হিন্দুধর্মী মানুষদের, ইসলামে দীক্ষিত করার বিবরণ দেওয়া আছে। হায়দ্রাবাদের নিজামের, হাজার হাজার হিন্দু পুরুষদের সুন্নত করিয়ে মুসলমান বানানোর ইতিহাসও আছে।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে, পর্তুগিজরা ভারতে আসেন এবং তখন থেকেই খ্রিস্টানদের সম্রাজ্যবাদী ধর্মমতের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজা কিংজন, দ্বিতীয় সেন্ট জেভিয়ার নামক পাদ্রীকে ভারতবর্ষে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার তাঁর আত্মজীবনে, গর্ব করে লিখেছেন—'আমি মাত্র এক মাসে ত্রিবান্দমে ১০ হাজার মানুষকে ধর্মান্তরিত করে পর্তুগালী নামকরণ করেছি।' এই কাজের জন্য অত্যাচার, ব্যভিচার, সবরকম পন্থা অবলম্বন করে সেন্ট জেভিয়ার। হিন্দু বিদ্বেষী এই সেন্ট জেভিয়ারকে 'সন্ত' উপাধি প্রদান করা হয়েছিল এবং তাঁর নামে ভারত তথা বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করে তাঁকে মাতৃমহিমামণ্ডিত করা হয় খ্রিস্টানদের দ্বারা। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে পোপের আদেশে খ্রিস্টান ধর্মকে স্থাপিত করার জন্য পর্তুগালী সেনা গোয়ার উপর আক্রমণ করে এবং সবাইকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন স্থাপিত হয় বাংলাতে। তারপর ১০০ বছর ধরে ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়ে যায় ইংরেজ শাসন দ্বারা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গরু এবং শুয়োরদের চর্বি বন্দুকের গুলিতে ব্যবহারের নামে এবং ধর্মান্তরণের বিভীষিকা থেকে বাঁচার জন্য আন্দোলন বা 'সিপাহী বিদ্রোহ হয়। যদিও এই যুদ্ধে ভারতীয়রা পরাজিত হয়। কিন্তু এরপর ইংরেজরা স্থির

করল, (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে) যত তাড়াতাড়ি হয় ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার প্রসার করা দরকার। উক্ত অনুরোধ করেন লর্ড পামরস্টন কেন্টরবারির আর্চ বিশপকে। ধর্ম পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ লর্ড মেকলেকে পাঠানো হয় ভারতবর্ষে। মেকলে বলেছিল, ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হিন্দুরা কখনোই নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে পারবে না এবং এই হিন্দুরাই আগে গিয়ে প্রচার করবে 'খ্রিস্টান ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং হিন্দু ধর্ম নিকৃষ্ট'।

২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই শহরের বৈঠক করে মুসলিম লীগ ভারত থেকে পৃথক হয়ে ইসলামিক রাজ্য পাকিস্তান বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'ডাইরেক্ট একশন ডে' করার আহ্বান জানায়। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন শহরে পরিকল্পিত-ভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিভিন্ন ইতিহাস আমরা জানি। এই আক্রমণও ছিল ধর্মান্তকরণের অভিযানের স্বরূপ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ধারা ২৫(A)-র সুযোগে খ্রিস্টান ধর্মীয় মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রদান করেন। এর ফলে স্বাধীনতার সময়ের ০.৭% খ্রিস্টানের সংখ্যা বেড়ে আজ প্রায় ৬% হয়ে গেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ডেমোগ্রাফি পাল্টে আজ হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নাগাল্যান্ডে মাত্র ২০০ জন খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু ২০০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে তা বেড়ে ৯০.০২% হয়ে গেছে। মিজোরামে ৯০% মানুষ, মেঘালয়ে ৭০.৩% মানুষ খ্রিস্টান আছেন। ওড়িশার কান্ধামাল জেলা আগে বনবাসীবহুল ছিল, এখন তা খ্রিস্টান ধর্ম বহুল হয়ে গেছে। পাঞ্জাব প্রান্তে খ্রিস্টান ধর্মীয়দের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে, যা কিন্তু চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্যামুয়াল রাজশেখর রেড্ডির সহায়তার ফলে, খ্রিস্টান ধর্মীয়দের সংখ্যা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেরালাতে হিন্দুদের সংখ্যা অদ্ভুতভাবে কমেছে এবং মুসলমান তথা খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেড়েছে। তামিলনাড়ু, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে খ্রিস্টানদের সংখ্যা তীব্র গতিতে বেড়েছে ধর্মান্তকরণের কারণে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ জনপোল ভারত ভ্রমণে এসে বলেছিলেন, প্রথম সহস্রাব্দ ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্ম বিস্তার পেয়েছিল, দ্বিতীয় সহস্র শতাব্দী আমেরিকা এবং আফ্রিকায় এবং বর্তমান তৃতীয় সহস্র শতাব্দী ভারতবর্ষ তথা শেষ বিশ্বে খ্রিস্টান ধর্ম বিস্তার লাভ করবে। মাদার টেরেসা, ফাদার জনসন ইত্যাদিরা এই কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই কাজের জন্য বিশ্বের খ্রিস্টান রাষ্ট্র থেকে অর্থ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ওই টাকায় চার্চের নির্মাণ তীব্র গতিতে বাড়ছে।

ইসলামীরা তো বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। যথা—দারুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামিক দেশ এবং দারুল হারাব অর্থাৎ কাফেরদের দেশ। মানবজাতির এই বিভাজন ততদিন ধরে চলবে, যতদিন না এই দারুল হারাব, দারুল ইসলামে পরিণত হয়। ইসলামে এইটিকে ধর্মযুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদ বলা হয়। গত ১৩০০ বছর ধরে তলোয়ার-বন্দুক, প্রেমের নাটক, লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ, বহুবিবাহ দ্বারা অধিক সন্তান উৎপন্ন করা থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ডেমোগ্রাফি পাল্টানোর কাজ করে চলেছে ওরা। এই কাজে আরব দেশ থেকে ডলার আসছে বিভিন্ন পথে। সৌদি আরব থেকে 'ইন্ডিয়ান ফেটার্নিটি ফোরাম' নামক সংস্থা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে, হাওলার মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছে ভারতে। হজ যাত্রীদের মাধ্যমে, পোশাক-গয়না ব্যবসার নামেও এই টাকা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই টাকার সাহায্যে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ হচ্ছে এবং ইসলামিক ধর্ম প্রচারকদের অর্থ যোগান চলছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন ছাপানো হচ্ছে এবং বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এই ধর্মান্তকরণের মুখ্য কারণ কি? হিন্দু সমাজ কেন ওদের মাকড়সার জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে? এর কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রথম কারণ হচ্ছে, আর্থিক দুর্বলতা—দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক মদত দেওয়ার ছলে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ধর্ম শিক্ষার অভাব—হিন্দুত্বনিষ্ঠ সংগঠন এবং কার্যকর্তারা সমাজে ধর্ম শিক্ষার প্রসার না করার ফলে নিজ ধর্মের প্রতি স্বাভিমান ভাব নির্মাণ না হওয়া এই ধর্মান্তরণের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ করছে। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, অতি সহিষ্ণুতার বৃত্তি—সর্ব ধর্ম সমান, এই মনোভাব হিন্দুদের মধ্যে আছে। অথচ খ্রিস্টান ধর্মীয়রা বলেন, খ্রিস্টান ধর্ম যারা পালন করেন না, তারা নরকে যাবে। এটিকে চরিতার্থ করার জন্য, জরুরি অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ সংবিধানে জুড়ে দেন। মাদার টেরেসাকে ভারতরত্ন উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। চতুর্থ কারণ হচ্ছে, দূরদৃষ্টির অভাব।

দেখা গেছে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা চরমপন্থী হন তাদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসার সুযোগের অভাবে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কালাপাহাড়। যে আগে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু নবাবের কন্যাকে বিবাহ করার ফলে তাকে জাতিচ্যুত করা হয়েছে। সে স্বধর্মে ফিরে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু হিন্দু ধর্মের ঠিকাদাররা বাধা দেয়। এই কালাপাহাড়ই বাংলা এবং উড়িষ্যাতে ধর্মান্তরণ ঘটিয়েছিল। আবার স্বধর্মে ফিরে আসা পরিবারের সন্তানদের বিবাহ নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে স্বধর্মে ফিরে আসতে চায় না মানুষ। অর্থাৎ রুটি-বেটি সম্পর্ক নির্মাণ করা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হিন্দু সমাজের একজন, মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে একজন হিন্দু কমে গেল তা নয়, বরং হিন্দু সমাজে একজন শত্রুর বৃদ্ধি হল।' একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক অরবিন্দ বিট্টাল কুলকার্নি বলেছেন, 'বিশ্বে এখন পর্যন্ত যুদ্ধে যত না রক্তপাত হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি রক্তপাত খ্রিস্টান এবং মুসলমান দ্বারা ধর্মীয় পরিবর্তনের কারণে হয়েছে।'

সংবিধানে ধারা ২৫এ, 'Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of Religion'—এই বাক্যে ঢোকানো হয়েছিল, যা খ্রিস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়রা করেছিল। অন্য কোন দেশের সংবিধানে প্রোপোগেট শব্দ পাওয়া যাবে না। খ্রিস্টানরা এই শব্দের আড়ালে ধর্ম পরিবর্তনের কাজ নিঃশব্দে করে চলেছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ২৫(১)-এর অনুসারে ধার্মিক স্বতন্ত্রতার অর্থ এই নয় যে অন্য কোন মানুষের ধর্ম পরিবর্তন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে যখন ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ সরকার ধর্ম পরিবর্তন রোধে আইন বানিয়েছিল, তখন ওই আইনের বিরোধ করার জন্য স্টেনস্লাস্স নামক এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছিল। তখন পাঁচজন বিচারকের পক্ষ থেকে এ.এন রায় বলেছিলেন, 'ধর্ম প্রসারের স্বতন্ত্রতার অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজের ধর্মে টেনে আনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু তার ওপর কোন চাপ বা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্ম পরিবর্তন করানো চলবে না।'

ইসলামিক সংগঠনের, মুসলিম দেশগুলো থেকে এবং খ্রিস্টান সংগঠনের, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য আসে। কিন্তু বিশ্বে একটাও হিন্দু রাষ্ট্র নেই, তাই হিন্দু সংগঠনগুলোকে বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য করার কোন দেশ নেই। কিন্তু হিন্দু ব্যবহারিক জীবনে অর্থ দান করার প্রবণতা আছে। তারই জন্য বিভিন্ন সেবা কার্য, মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। অহিন্দু ধর্ম প্রচারকদের কাছে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ আসে। এবং তারা ধর্ম পরিবর্তনের কৌশল শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারা হিন্দু ধর্মের সামান্য জ্ঞান, মন্ত্রাতি অধ্যায়ন এবং তার অপব্যাখ্যা করে হিন্দু জনমানসে ধর্মের প্রতি বিভ্রান্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের কৌশল হিন্দুত্বনিষ্ঠ কার্যকর্তাদেরও অর্জন করা দরকার। ধর্ম পরিবর্তনের কোন ঘটনার আভাস পাওয়া মাত্র স্থানীয় প্রশাসনকে খবর দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। আশেপাশের আদিবাসী, পিছিয়ে থাকা বস্তিগুলোতে স্বধর্মের প্রচার করার উচিত এবং স্বধর্মের প্রতি গর্ববোধ অনুভব করানো দরকার। শিশু অবস্থা থেকে তাঁদের মধ্যে ধার্মিক সংস্কার জাগরণ করা দরকার।

হিন্দুদের মধ্যে জনজাগরণের জন্য সৎসঙ্গ, ধার্মিক প্রবচন, সনাতনী শিক্ষা দেবার গ্রন্থগুলোর বিতরণ, তুলসী গাছ বিতরণ বাধ্যতামূলক করা দরকার। ধার্মিক পরিবর্তনের জন্য উৎপন্ন ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা দরকার। যেমন—সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন, যদি কোন এস.সি, এস.টি ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তার সরকার প্রদত্ত এস.সি, এস.টি হিসেবে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেওয়া বন্ধ করা হবে। মুসলিম ও খ্রিস্টান পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিশুদের পড়ানো উচিত না, কারণ সেখানে ওদের ধার্মিক শিক্ষা প্রাপ্ত করে বিধর্মী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্র সরকার এইসব বিদেশি অর্থের আগমনকে প্রতিহত করার জন্য FCRA আইনকে আরো দৃঢ় করেছে এবং fake NGO-কে (প্রায় ৩০ হাজার) বন্ধ করে দিয়েছে।

এইসব প্রয়াসের কারণে যাঁরা হিন্দু ধর্ম পরিবর্তন করে অন্য ধর্মে চলে গেছেন, তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার পথকে মসৃণ করে তুলতে হবে। খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরণের উপায়গুলো সম্পর্কে জানা দরকার। বিদ্যালয়ে হিন্দু বাচ্চাদের বাইবেল দেওয়া এবং খেলনাতে যীশুর ছবি দেওয়া, বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের প্রলোভন দেওয়া, এবং ধর্মপ্রচারক বানানো, গরিব বস্তিগুলোতে সেবার ছলে ওষুধ-পত্র দেওয়া, টোটকা নামে ভ্রমিত করা, ক্রিসমাসের

নামে বস্ত্র অথবা বস্তু সহায়তা দেওয়া, প্রাকৃতির দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়ার পর খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ নির্মাণ করা, অনাথালয় নির্মাণ করা, শিশুদের ধার্মিক শিক্ষা দিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করানো, এমনকি বন্দী গৃহে বা কারাগারে গিয়ে শান্তির নামে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করা। প্রেত, বাধা ভূত-প্রেতের হাত থেকে বাঁচার জন্য 'ক্রস' ব্যবহার করার অন্ধ বিশ্বাসকে ছড়ানো, কনফেস রুমে অপরাধীর অপরাধ স্বীকার করলে পাপমুক্ত হওয়ার মতো ভ্রান্তি ছড়ানো, এই ধরনের ধার্মিক নাটক হয়। আধুনিক সময়ে অনেক পাদ্রী বা নান্সরা গৈরিক বস্ত্র পর্যন্ত ধারণ করা শুরু করে দিয়েছে। চার্চগুলোর প্রবেশদ্বার অনেকটাই মন্দিরের মতো সাজানো, মোমবাতির বদলে তেলের প্রদীপ জ্বালানো। হিন্দুদের ভ্রমিত করার জন্য খ্রিস্টান সংস্থাগুলোর নাম ইশবানী, শ্রীবানী নোবেলিয়নের পরিবর্তে জ্ঞানপীঠ ইত্যাদি রাখা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ভারত নাট্যমের ছলে বৈদিক মুদ্রার স্থানে খ্রিস্টিয় মুদ্রার অভ্যাস করানো হচ্ছে। শিখদের সমান আচরণ করে শিখপন্থ এবং খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সমানতা দেখানোর প্রয়াস করা হচ্ছে। অন্ধপ্রদেশের মন্দিরের মতো পাহাড়ের উপর চার্চ বানানো হচ্ছে। যে কোন পাহাড়ে ত্রিশূলের স্থলে ক্রুস রোপণ করে, সেই পাহাড়কে নিজেদের বলে দাবি করা হচ্ছে। কেরালাতে বাইবেল পঠনকে, বেদ পঠন বলা হচ্ছে। কিছু কিছু চার্চের সামনে তীর্থক্ষেত্রের ফলক লাগানো হচ্ছে। সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক একজন খ্রিস্টান মিশনারীকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের এবং দেবতাদের নিন্দা কেন করেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, হিন্দুদের অন্তর মন থেকে স্বধর্মের আস্থাকে নষ্ট করাই উদ্দেশ্য, যাতে তারা খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হন। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দু এবং অহিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্রে মিশনারীদের হাত দেখা গেছে। জনগণনার সময় হিন্দুদের নামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের কলমে খ্রিস্টান লেখানোর চেষ্টা করে জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে মুসলমানরাও ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমানতা দেখানোর বিভিন্ন অপচেষ্টা করে চলেছে। যেমন, মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারাম এবং মহম্মদ পয়গম্বরের শিক্ষা একই বলে ভিডিও বানিয়ে প্রচার করা হচ্ছ। 'কল্কি অবতার তথা মহম্মদ পয়গম্বর' নামক পুস্তকের মাধ্যমে পয়গম্বরকে বিষ্ণুর দশম অবতার বলা হয়েছে। হিন্দুদের ১০৮ পুরাণের মধ্যে আল্লোপনিষদ একটি বলে প্রচার করা হচ্ছে। স্বামী লক্ষ্মী শঙ্করাচার্য এই ছদ্মনামে পুস্তক 'ইসলাম আতঙ্ক নয়' আদর্শ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ইসলামের সমানতা দেখানো হয়েছে। 'শুনো আপনে রব কি' পুস্তকে মূর্তি পূজা নরকের মার্গ বলে প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামিক ধর্ম প্রচারক জাকির নায়েকের পুস্তকে শ্রীরামচন্দ্রকে মাংসাহারি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। লাভ জিহাদের ছলে হিন্দু যুবক-যুবতীদের বিয়ে করে সেক্স স্লেভ বানিয়ে বাচ্চা উৎপন্ন করার জন্য যন্ত্র তৈরি করছে মুসলমান যুবকরা। তান্ত্রিক বিদ্যার প্রয়োগ করে হিন্দু মহিলাদের বশীকরণ করা হচ্ছে (হয়তো আধুনিক যুগে বিশ্বাস নাও করা হতে পারে)। কারাগারে অপরাধীদের মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করে জেহাদি বানানোর চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্ন উৎপন্ন হয় খ্রিস্টান দেশগুলোতে কেন তবে এত দুরাচার হয়। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে সেখানে, তাহলে কি খ্রিস্টান ধর্মচারীদের সংস্কার হয়নি? যীশুখ্রিস্টের অনুরাগীরা কেন শান্তির কথা বলেন না? আমেরিকা তো, কথায় কথায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাদের কেন যীশু সৎবুদ্ধি দেন না। খ্রিস্টান ধর্মীয়রা কেন মুসলিম বস্তিতে বাইবেল বিতরণ করেন না? কেবলমাত্র হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য যত রকম ষড়যন্ত্র সেবার আড়াল থেকে হয়ে থাকে। আমাদের প্রশ্ন এইসব এরূপ কেন হবে? হিন্দুদের ভাবা দরকার।

আবার অন্যদিকে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলো কেন একে অপরের ওপর নানা রকম আক্রমণ হানছে? তাদের মুসলিম ব্রাদারহুড কেন সেখানে থাকে না? শিয়া, সুন্নি, আহমেদিয়া ইত্যাদি ২৬টি জাতির মানুষ কেন একত্রে থাকতে পারেন না? ভারতবর্ষে বেশিরভাগ আতঙ্কবাদীরা কেন মুসলিম হন? মানুষ জীবনে কোন পুণ্য কাজ না করেও জিহাদিরা জন্নতে ৭২টি হুরের সঙ্গে থাকার প্রলোভনে হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ ইত্যাদি অপকর্ম করে। এই সমস্ত বিষয় ভাবা এবং জানার দরকার। বাস্তবে ধর্মান্তরণের কাজে ছলে-বলে-কৌশলে ইসলামীদের এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সমানতা দেখা যায়। ওদের নানাবিধ ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় একমাত্র স্বধর্মের আচরণ এবং সংগঠন দ্বারাই সম্ভব। সাধারণ মানুষকে এই সমস্ত তথ্য জানানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। ■

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি : এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান

পারমিতা পাল

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এমন একটি ধর্মপ্রাণা, ন্যায় প্রিয় এবং রাষ্ট্রভক্ত মাতা পিতার সন্তান ছিলেন, যাঁদের প্রসিদ্ধি শুধুমাত্র বাংলাই ছিল না, বরং সম্পূর্ণ ভারতে ছিল। মাতা যোগমায়া দেবীর কাছ থেকে ধার্মিক এবং ঐতিহাসিক গল্প ও নীতিকথা শুনে যেমন দেশের সংস্কৃতিক জ্ঞানপ্রাপ্ত করেছিলেন, তেমনি পিতা আশুতোষ মুখার্জির কাছ থেকে রাষ্ট্রভক্তির শিক্ষা পেয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার বিধান পরিষদের সদস্য হন। ১৯৩৪-৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-কুলপতির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বাংলার বিত্তমন্ত্রী ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি মহাবোধি সোসাইটি এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। তাঁর আগেই তিনি সংবিধান সভার সদস্য হন এবং শিল্প দপ্তরের দায়িত্বও পালন করেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী চেষ্টা করেছিলেন, ভারতবর্ষের বিভাজন যাতে না হয়। তার জন্য তিনি গান্ধীজির কাছে যান। কিন্তু গান্ধীজি বলেন, 'কংগ্রেসের নেতারা ওঁনার কথা শুনতে চাইছে না। এমনকি নেহরু পর্যন্ত বিভাজনের পক্ষে আছে। সুতরাং বিভাজন অনিবার্য।' বিভাজন হওয়ার পর সম্পূর্ণ বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তান বলে ঘোষণা করা হয়। তখন শ্যামাপ্রসাদজির চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গকে ভারতে রাখার সহমত হয়, অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদজি না থাকলে আজ আমরা পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে সংখ্যালঘু হয়ে বাস করতাম। বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের জনকরূপে কেবলমাত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেই মান্যতা দেওয়া উচিত। জওহরলাল নেহরু দ্বারা উদ্বাস্তুদের প্রতি অবহেলা দেখে প্রতিবাদ করে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তিনি নেহরু মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রী পরিষদ থেকে ত্যাগপত্র দেওয়ার পর, ওঁনার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘ চালক শ্রীমাধব রাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকারজির (শ্রী গুরুজি) সাথে দেখা হলে, ওঁনাকে সনাতনপন্থী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসংঘের দায়িত্ব নিতে বলা হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ২১শে অক্টোবর ভারতীয় জনসংঘের গঠন হয় এবং শ্যামাপ্রসাদজি সংস্থাপক সভাপতির দায়িত্ব নেন। শ্রীগুরুজি পার্টির কাজ করার জন্য আটজন প্রচারককে মুক্ত করে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাতে তুলে দেন।

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ২৫শে অক্টোবর ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হয়। ঐ নির্বাচনে জনসংঘ মাত্র ৩টি লোকসভার সাংসদ পায়। তার মধ্যে দুইটিই ছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ফলে বিরোধী দলনেতা হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু ওঁনাকে সাংসদে ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স-এর নেতা নির্বাচিত করা হয়। এক ভাষণে নেহরু বলেন, 'জনসংঘ একটি কমিউনাল পার্টি এবং আই উইল ক্র্যাশ জনসংঘ' (I will Crush Jana Sangha)। তখন উত্তরে শ্যামাপ্রসাদজি বলেছিলেন, 'মাই ফ্রেন্ড নেহরু, সেজ দ্যাট, হি উইল ক্র্যাশ জনসংঘ। আই সে, আই উইল ক্র্যাশ দিজ ক্র্যাশিং মেন্টালিটি' ('My friend Nehru says that, he will Crush Jana Sangha. I say I will Crush this crushing mentality') সংসদে সংখ্যার দৃষ্টিতে জনসংঘ কিছুই ছিল না, কিন্তু ওঁনার তেজস্বী ভাষণ সবাই মন দিয়ে শুনতেন।

এবার একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে যাচ্ছি। দেশভাগের পর কাশ্মীরের রাজা হরিসিং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, তিনি ভারতবর্ষে কিংবা পাকিস্তানের কোন দিকে থাকবেন। সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দিয়ে সরসংঘ চালক শ্রীগুরুজি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর রাজা হরিসিং-এর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য, শ্রীনগরে পৌঁছলেন। পরের দিন ১৮ অক্টোবর বৈঠক শেষে রাজা হরিসিং বলেন, 'ভৌগোলিক দৃষ্টিতে আমার রাজ্যের সীমানা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত, তাই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাই হয়তো ভালো হবে।' উত্তরে শ্রীগুরুজি ওঁনাকে বলেন, 'আপনি একজন হিন্দু রাজা, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে আপনার হিন্দু অস্মিতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। কিন্তু যদি আপনি ভারতের সঙ্গে

যুক্ত হন, তাহলে ভারত সরকার আপনাকে সব রকম সহায়তা করে, কাশ্মীরকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে।' এর ৮ দিন পর রাজা হরিসিং ভারত ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তারপর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরে হানাদারদের বেশে পাকিস্তানী সেনারা ঢুকতে শুরু করে। তখন সর্দার প্যাটেল ভারতীয় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিমানবন্দর বড় না থাকায়, অসুবিধা দেখা গেল। তখন শ্রীগুরুজির নির্দেশে কয়েক হাজার স্বয়ংসেবক নিজেদের শ্রম দিয়ে রাতারাতি অস্থায়ীভাবে বিমান নামার উপযুক্ত জায়গা তৈরি করে দেন। ভারতীয় সেনার পরাক্রমে পাকিস্তানী হানাদাররা পালাতে শুরু করে। কিন্তু হঠাৎ করে নেহরু যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন। যার ফলে কাশ্মীরের কিছুটা অংশ পাকিস্তানে অধিকৃত (POK) রূপে থেকে যায়। নেহরুর ওই সিদ্ধান্ত আজও ভারতের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে আছে।

সে সময় সংবিধান সভায় ৩৭০ ধারা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তখন শেখ আব্দুল্লার ষড়যন্ত্রে নেহরু বিদেশে চলে গেলেন। ধারা ৩৭০-এর বিরোধ কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও দেখা গেলেও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, গোপাল স্বামী অয়ংগার এটিকে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে সংসদের স্বীকৃতি আদায় করে নেন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদজি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫(এ) ধারার ফলে ভারতবর্ষ জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব হবে।' বাস্তবিক অবস্থায় আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। সেই সময় অন্য প্রদেশের মানুষকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে হলে, পারমিট লাগতো। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কাশ্মীরে প্রবেশ করতে গেলে, ওঁনাকে আটকানো হয়। তখন তিনি বলেন, 'আমি ভারতবর্ষের একজন সংসদ সদস্য, আমি আমার দেশে প্রবেশ করার জন্য পারমিট নিতে পারবো না।' তিনি কাশ্মীরে বিনা পারমিটে ঢুকে, অখণ্ড ভারতের বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধানের দিশাতেই চলবে।' কাশ্মীরের শেষ যাত্রার আগে গুরুজি শ্যামাপ্রসাদজিকে বলেছিলেন, 'আপনার জন্য কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে বড় কোন ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন।' প্রত্যুত্তরে শ্যামাপ্রসাদজি বলেছিলেন, 'আমি ফাঁদে পড়েছি, তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার এই যাত্রা কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির শপথ নেওয়ার আদর্শে দেশকে অনুপ্রাণিত করতে পারলে, সেটাই পরম প্রাপ্তি হবে।'

কাশ্মীরে প্রবেশ করার জন্য ওঁনাকে গ্রেফতার করা হল। ৪০ দিন পর্যন্ত ওঁনাকে কোন চিকিৎসার সুবিধা, মৌলিক সুবিধা দেওয়া হয়নি। ২৩শে জুন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রহস্যময় পরিস্থিতিতে ওঁনাকে মৃত ঘোষণা করা হল। অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদজির বলিদান সেদিন কলকাতা বাসিরা (প্রায় ২ লক্ষ) তাঁর শেষকৃত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সংকল্প সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সংকল্প হয়ে উঠেছিল। অনেক মহান ব্যক্তিরই পুণ্য তিথি পালন করা হয়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদজির পুণ্য তিথিকে (২৩শে জুন) ভারতীয় জনসংঘ অর্থাৎ বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি 'বলিদান দিবস' রূপে পালন করে, ৩৭০ ধারা সমাপ্তি করার সংকল্প করতেন। গত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিভাজনের রেখারূপি ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারাকে সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদি এবং গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এমন একটা সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা বাস্তবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সংকল্পকে সিদ্ধি প্রদান করে। আবার ৪ঠা মে ২০২৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাসস্থানের প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গে) সনাতনী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ওঁনার আত্মাকে পরম তৃপ্তি প্রদান করেছে, পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী মানুষ। বাস্তবে আমার মনে হয়, এই বছর ২৩শে জুন আমরা ওঁনার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করতে পারব। ■

পরিষদ বার্তা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার বৈঠক

গত ২৮/০৫/২০২৬ তারিখে বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আমলাগড়া গড়বেতা শ্যাম ভবনে বিশ্ব হিন্দু বার্তার সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু বার্তার পূর্ব ভারতের প্রচার ও প্রসার প্রমুখ মাননীয় জয়ন্ত ভৌমিক মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সোশ্যাল মিডিয়া প্রমুখ মাননীয় বরুণ কান্তি পাল মহাশয়, সংযোগ প্রমুখ মাননীয় মানবেন্দ্র সামন্ত মহাশয়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং এবং সদস্যা অঞ্জুশ্রী দলুই মহাশয়া।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের জয় হয়েছে—কিন্তু সতর্কতাও দরকার

ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ

৪ঠা মে, ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। হিন্দু বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৃণমূলী অপশাসনের অবসানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী তথা জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে প্রচণ্ড নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এরপর ফলতায় পুনর্নির্বাচনেও বিজেপির জয়যাত্রা অব্যাহতই রয়েছে। তৃণমূলের কাপুরুষ যুবরাজের ডায়মণ্ডহারবার মডেল, গৈরিক ঝড়ে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। এককালের মহাপ্রতাপান্বিত এই যুবরাজটিকে এখন অবশ্য প্রকাশ্যে তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। হিন্দুদের প্রকাশ্যেই নানাভাবে ধমক চমক দেওয়ার যে নিকৃষ্টকর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন, এখন সেই কৃতকর্ম তথা পাপের ফল তাকেই তাড়া করে বেড়াচ্ছে। নিয়ম করে প্রত্যহই রাজ্যের কোন না কোন স্থান থেকে তৃণমূলী দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূলী নেতা-মন্ত্রী তথা তৃণমূলের অন্যান্য পদাধিকারীরা গ্রেফতার হচ্ছে যা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। বলাই বাহুল্য যে বিজেপি সরকারে আসার শুরু থেকেই একেবারে কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েছে। এই কাজ হল স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার কাজ এবং এরই পাশাপাশি বিজেপি সরকার সোনার বাংলা গড়ে তুলতে একেবারে বদ্ধপরিকর।

আমরা যদি সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা বোঝা যাবে যে, নির্বাচন কমিশনের যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনায় এবার এই রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছে এবং তার ফলস্বরূপ ঘটেছে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়। বিজেপির এই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হওয়া পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে। এর কারণ, স্বাধীনতার পরে এই প্রথমবার এই রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী সরকার গঠিত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে নির্বাচনে বিজয়ী বিজেপির বিধায়কদের তালিকায় একজনও মুসলমান বিধায়ক নেই। কাজেই এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই জয় প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের জয়। আরও স্পষ্ট ভাবে বললে এই কথাই বলতে হয় যে, সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জনজাগরণ ঘটেছে এই রাজ্যে, যার ফলে হিন্দুবিরোধী শক্তিগুলি সবক'টিই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ সনাতন ধর্মের পবিত্র গৈরিক রঙে সেজে উঠেছে। আসলে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র ভূমিতে এই প্রথমবারের জন্য বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। অগণিত হিন্দুর ত্যাগ স্বীকার তথা বহু ক্ষেত্রেই তাদের চরম আত্মবলিদানের কথা এই প্রসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না। নিঃসন্দেহেই এই জয় হিন্দুসমাজকে উজ্জীবিত করেছে। এই নির্বাচন বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ছিল এবং বাঙালি হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অত্যাচারী শয়তানী শক্তিকে পরাজিত করেছে। এই বিধানসভা নির্বাচনের তাৎপর্য তাই অপরিসীম।

এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে কথাটার অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, বিরোধীরা চিরতরে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস হল এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে বিজেপি লক্ষাধিক ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই নির্বাচনে তৃণমূলকে অনেক পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বামেরা। এখানেই সতর্কতা আবশ্যক। লক্ষণীয় যে, বিজেপি সরকারে আসার পর থেকেই হিন্দুবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই প্রকাশ্যে একজোট হওয়া শুরু করেছে। একদিকে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বিজেপি বিরোধী একটা সর্বদলীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরির আহ্বান শোনা গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তৃণমূলের চোর, ডাকাত, মাফিয়াদের হয়ে আদালতে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে সিপিএমের বর্ষীয়ান আইনজীবীকে। বোঝাই যাচ্ছে যে, বিজেপির ভয়ে এখন বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ একেই বলে।

নিঃসন্দেহেই হিন্দুদের ভোটের কারণেই পশ্চিমবঙ্গে

বিজেপির এই বিপুল জয় সম্ভব হয়েছে। এখানে আরও একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। ভারতের বিভিন্ন নির্বাচন এটাই প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা সাংঘাতিক ভাবেই রাজনীতি সচেতন। ফলতার এই নির্বাচন সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে। হিন্দু ভোট একচেটিয়াভাবেই পেয়েছে বিজেপি। কিন্তু, মুসলমান ভোট তৃণমূলকে ছেড়ে বামেদের দিকে চলে আসছে। ফলতার নির্বাচনে এটাই প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরা জানে যে, কোন নির্বাচনে ঠিক কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দিলে বিজেপিকে আটকানো সম্ভব হতে পারে অথবা বিজেপির বিরুদ্ধে খানিকটা হলেও সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ফলতা পুনর্নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী জাহাঙ্গীরকে নিয়ে আগে থেকেই একটা গোলমাল চলছিল। নির্বাচন থেকে তার সরে দাঁড়ানোর সংবাদ আসার পরে খুব সচেতনভাবেই মুসলমান ভোটের বিপুল অংশ পেয়েছে বামপন্থীরা। সিপিএম চিরদিনই প্রচার করেছিল যে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে নাকি একটা সেটিং আছে। অন্যদিকে তৃণমূলের একটা অংশ আবার এটাই প্রচার করত যে, বামের ভোট রামে গিয়েছে এবং এর ফলেই বিজেপির উত্থান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, ২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে চিরদিনই সেটিং ছিল, আছে এবং থাকবে। বস্তুত দেশবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে সেটিং থাকাই তো স্বাভাবিক। এখানে পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ হিন্দুত্ববাদীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক বামপন্থী ও তৃণমোল্লা নেতা-নেত্রী রং বদল করে গেরুয়া রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যারা ঈশ্বর ও তাঁর মহিমায় বিশ্বাসী নয়, যাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা এবং সনাতন ধর্ম সম্পর্কে এতটুকু গৌরবের অনুভূতি নেই, সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা গৌরব বোধ করে না, যাদের হিন্দুত্ব সম্পর্কে ধারণাটাই গোলমেলে, যারা মার্ক্স এবং মেকলের যথার্থ বংশধর, যারা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গর্বিত হওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পায় না, যাদের মতে ভারতীয়রা শিক্ষিত হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই—এমন মানুষেরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এরা ধরা পড়ে যায়। এরা কেউ কেউ প্রকাশ্যে দুধেল-গাই তত্ত্বের অবতারণা করে থাকে, কেউবা প্রকাশ্যে গরুর মাংস ভক্ষণ করে থাকে, কেউবা হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে কুৎসিত কটূক্তি করে থাকে, আবার কেউ বা নানাবিধ তথাকথিত অসার যুক্তি-তর্কের আড়ালে হিন্দু বিদ্বেষী ভাবনার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করে থাকে। এইসব সুবিধাবাদী আর ধান্দাবাজ ব্যক্তিদের থেকে সততই দূরে থাকতে হবে এবং এদের আদর-আপ্যায়ন করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা কখনই চলবে না।

হিন্দু সমাজকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করবার জন্য ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাইরে বহু প্রকার ষড়যন্ত্র চলেছে। কিন্তু, কোনওভাবেই এইসব ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে হিন্দু ভোট ভাগাভাগি করা চলবে না। মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুদের একতার মাধ্যমেই হিন্দুত্বের প্রচার ও প্রসার সম্ভব। বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই এক ও একমাত্র লক্ষ্য হল ছলে-বলে-কৌশলে এই হিন্দু ভোটকে একজোট হতে না দেওয়া। ২০২৬-এর নির্বাচনেও এই চেষ্টা করা হয়েছে এবং আগামী দিনেও এটাই করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতেই সনাতনী সংস্কৃতি তথা সনাতন ধর্মের জয়যাত্রা অটুট রাখতে হলে দেশ তথা সমস্ত রাজ্যেই হিন্দুত্ববাদী সরকার থাকাটা অত্যাবশ্যক। কারণ, রাজশক্তি সহায় থাকলে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম রক্ষা করা অনেক সহজ হয়ে থাকে। ইতিহাস যুগে যুগে এই কথাই বলে এসেছে। তাই মনে রাখতে হবে যে ২০২৬-এ এক মহান কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছে মাত্র। এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সেদিনই হবে যেদিন পশ্চিমবঙ্গ তথা সমস্ত ভারতভূমি থেকে হিন্দু বিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। এই কাজে সমাজের সর্বস্তরের হিন্দুদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান একান্তই কাম্য। এই রাজ্য তথা সমগ্র দেশ এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও জাগ্রতবিবেক সম্পন্ন হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হিন্দু-বিদ্বেষীদের সর্বপ্রকারে পরাজিত করবে ও ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে—সেদিনই ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। কোন প্রলোভন তথা কোন প্রতিবন্ধকতার কাছে হেরে গেলে চলবে না।

ভগবান সকলকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, এটাই কাম্য। ■

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিকথা

মনোজ শা

আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছি সেই ব্যবস্থা কি আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছে?

গত সাত দশক ধরে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কি আমরা সন্তুষ্ট?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে।

আমাদের সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা কালো ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে আমাদের সমস্ত কন্টেন্ট এবং কারিক্যুলাম পাশ্চাত্যের অনুকরণ।

আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাজ ধর্ম হিসেবে অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে আমাদের গাইড হিসেবে পড়ি না, আমরা এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসেবে শ্রদ্ধা করি।

আমরা আমাদের বাচ্চাদের পশ্চিম এশিয়াকে মধ্য এশিয়া পড়ায়, ভাস্কো দা গামা ভারত আবিষ্কার করেছিলেন পড়াতে আমাদের লজ্জা হয় না। আমরা ভুলে গেছি, প্রাচীন ভারতে অনেক উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলোজফি, ম্যাথমেটিক্সের সাথে সাথে ইতিহাস, সৌরবিজ্ঞান, এবং অর্থশাস্ত্র পড়ানো হতো। ছন্দগীয় উপনিষদে ১৮টি বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর উল্লেখ আছে।

এই কথা ঠিক প্রাচীন ভারতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে কোন দিনই ছিল না, তা সত্ত্বেও আমরা প্রাচীন ভারতের একটা কমন সিস্টেম দেখতে পাই, সারাদেশে গুরুকুল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পাঠশালা আমাদের গ্রাম্য ব্যবস্থার এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অভিন্ন অঙ্গ ছিল। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী ধর্মপাল তার বই 'দ্য বিউটিফুল ট্রি'-তে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনকালে এই ট্রির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। মেকলে শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজতন্ত্র সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এক শ্রেণীর চাকর তৈরি করা। যারা দেখতে শুনতে ভারতীয়, কিন্তু মনে প্রাণে ইংরেজ। আমাদের বহু মনীষী ব্রিটিশের এই মরীচিকায় আকৃষ্ট হন এবং ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেন। গান্ধীজি ইংরেজদের পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি মনে করতেন মানুষকে লিটারেট বা ইনফর্মড করা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁর মতে শিক্ষা হচ্ছে শরীর, মন, এবং আত্মার মধ্যে এক সমন্বয়। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মর্মাহত হন এবং প্রাচীন গুরুকুলের আদলে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলেন।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত, একজন শিক্ষক যখন তার ছাত্র-ছাত্রীর সাথে জঘন্যতম দুষ্কর্ম করেন, একজন বিজ্ঞানী যখন আতঙ্কবাদিতে পরিণত হন, একজন ডাক্তার যখন কিডনি পাচারের কাজে যুক্ত হন, একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন সেতু তৈরিতে গোলমাল করেন, তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমাদেরকে মানুষ করতে পেরেছে? বর্তমান ব্যবস্থা শুধু টাকা রোজগারের যন্ত্র তৈরি করতে পারে, দেশ গড়ার সৈনিক নয়। স্বাধীনতা আমাদের আত্ম অবলোকনের একটা সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি। এখনো যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক মার্ক দর্শন না করাতে পারি, তবে ইতিহাসের পাতায় আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকেই নষ্ট করার অপরাধে অপরাধী হব।

আমাদের স্বপ্নের সমাজকে বাস্তব রূপ দিতে আমাদের কর্তব্য বর্তমান ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন। দেশের সংস্কৃতি লালন-পোষণ তথা বিদ্যার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন। মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক। প্রাথমিক শিক্ষা বিদেশি ভাষায় করলে ব্যক্তি নিজের পরিবেশ, সংস্কার, সংস্কৃতি মূল্যবোধ থেকে দূরে চলে যায়। সে তার পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত শাস্ত্র, জ্ঞান, সাহিত্য প্রকৃতি থেকে অনভিজ্ঞ থেকে যায়। যার ফলে আস্তে আস্তে জাতি তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে।

তাই আজ আমি আপনি সকলে মিলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হই। ■

ভারতের জন্য বিপদসঙ্কেত

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

গত (জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যার পর...

ব্রিটিশরা ভারতের জাতব্যবস্থার জটিলতা ধরতে পারেনি। অর্থাৎ বিভিন্ন পেশার লোকের মধ্যে সামাজিক মেলামেশায় কোন নিষেধ ছিল না। কিন্তু এক একটা জাতের লোকের নিজেদের মধ্যে পেশাগত মিল থাকায় একটা এমপ্যাথি কাজ করত এই বিষয়টা তারা বুঝত না। এখনো সব দেশেই যেমন চিকিৎসক গোষ্ঠির সব মানুষের একটা মেলামেশা আছে। আবার সব ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে একটা সখ্য আছে। সব প্রশাসকদের মধ্যে আছে, সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আছে। আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তারা ব্যর্থ হয়ে জাতব্যবস্থার সঙ্গে রক্তের বিশুদ্ধতা গুলিয়ে ফেলল। ভারতে জাতব্যবস্থা কখনো কোন সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ধূর্ত ঔপনিবেশিকরা এটাকেই হাতিয়ার করে কাস্ট ব্যবস্থার সঙ্গে জাতব্যবস্থা এক করে দিল। তারা ইচ্ছে করে একটা তালিকা বা শিডিউল তৈরি করল। এতে অন্তর্ভুক্তরাই এখনকার শিডিউল্ড কাস্ট মানে তালিকাভুক্ত জাত সংক্ষেপে এস.সি। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশরা বাধ্য করল সবাইকে এই কাস্টভিত্তিক শিডিউলে নাম লেখাতে। এল ফলে জাত ব্যবস্থা ওদের কারণে ক্রমশঃ অনমনীয় ও বদ্ধ হয়ে পড়ল। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণবিভেদ ও জড়িত দাসব্যবসার জন্য সেটাই হয়ে উঠল ওদের একমাত্র পরিচয়। এটাও বলা হল যে আমেরিকানদের এর জন্য নাগাড়ে অনুতাপ করে যেতে হবে। ওদের কয়েক প্রজন্ম ধরে শেখানো হতে লাগল তারা যেন নিজের দেশকে ঘৃণা করতে শেখে।

আমেরিকানদের জিজ্ঞাসা করি, ''তোমরা যা করছ করো তোমাদের খুশি কিন্তু তোমরা জোর করে ভারতের উপর একটা মিথ্যা আখ্যান কেন চাপিয়ে দিচ্ছ?'' কিভাবে ওরা এটা করেছে বা করে চলেছে? যে কাজ দুই শতক আগে ম্যাক্সমুলারকে দিয়ে অক্সফোর্ড করিয়েছিল, সেই কাজটাই এখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় করাচ্ছে গবেষকদের দিয়ে, আফ্রো-দলিত আত্মপরিচয়কে একাকার করে ফেলছে এবং সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে। আর একটু খুলে বলি। ওরা আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের বলছে, ''দেখ এক সময়ে তোমাদের উপর আমরা অত্যাচার করেছি, তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্লেভ বানিয়ে অত্যাচার, নির্যাতন করেছি। কিন্তু সেই সব দিন তো আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন তোমাদের আমরা সমানাধিকার দিয়েছি, তোমরা এখন ভালো আছ। যেটুকু খারাপ তোমাদের সঙ্গে হয় তা ব্যতিক্রম। ওটা চলে যাবে। কিন্তু ভারতে তোমাদের জাতভাইরা এখনো অত্যাচারিত হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের দ্বারা। ওখানকার অত্যাচারিতদের বলে 'দলিত' মানে অপ্রেস্‌ড।'' অর্থাৎ কাস্টকে রেসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে ইচ্ছাকৃতভাবে। তার ফল দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ = দলিত, শ্বেতাঙ্গ = ব্রাহ্মণ, ক্রিটিকাল রেস থিওরি = ক্রিটিকাল কাস্ট থিওরি।

একজন লেখিকা ইসাবেল উইলকার্সন তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ গ্রন্থ কাস্ট : দ্য অরিজিন অব আওয়ার ডিসকন্টেন্ট-এ লিখেছেন ভারতের জাতব্যবস্থাই নাকি বিশ্বব্যাপী রেসিজম বা বর্ণবিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। নষ্টামির চূড়ান্ত। আগেই বলেছি কাস্ট আর রেস সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতে সেই অর্থে কাস্ট ছিল না। শব্দটা বিদেশি এবং ব্যবস্থাটাই স্পেন-পর্তুগালে উৎপন্ন। আর রেস সম্পূর্ণ ইউরোপ-আমেরিকার সৃষ্টি। এই গ্রন্থটাই ওদের দেশে বেস্টসেলার। টিভি আয়োজক ওপরা উইনফ্রি এর জন্য প্রচার চালিয়েছেন। ২০২১-এর ১০-১২ সেপ্টেম্বর 'ডিসম্যান্টলিং গ্লোবাল হিন্দুত্ব' বা 'বৈশ্বিক হিন্দুত্ব ভেঙে ফেলা' নামে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। সেখানে আমেরিকার কয়েকটা প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছিল। তাতে আলোচনা করে স্থির করা হল যে পুরো হিন্দু ধর্মকে উপড়ে ফেলে না দিতে পারলে বিশ্বব্যাপী অসাম্য দুর হবে না। হিন্দুত্ব আর হিন্দুইজমকে আলাদা করা ছিল একটা প্রসাধনী প্রলেপ, যাতে তাদের মূল লক্ষ্যকে গুলিয়ে দেওয়া যায়। বাস্তবে মুসলমান আক্রমণকারীরা কোটি কোটি হিন্দু (এর মধ্যে দলিতরাও আছে), বৌদ্ধ, জৈন, শিখদের হত্যা করেছে, তাদের মন্দির ধ্বংস করেছে। কিন্তু বামেদের কাছে বস্তুগত সত্য বলে কিছু হয় না। তাই তাদের কাছে হিন্দুরা নির্যাতনকারী আর মুসলমানরা নির্যাতিত।

দীপ্তি রাও নামে এক ভারতীয় নারী লেসবিয়ান

এলজিবিটিকিউ, গোষ্ঠিতে যোগ দিয়েছিল। এই গোষ্ঠির লোকদের হিন্দু ধর্ম ও ভারতের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। তারা খুব উচ্চকণ্ঠে বলত হিন্দু ধর্ম জাতপাতমূলক আর নির্যাতনকারী; ভারতের সব সমস্যার মূলে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতন্ত্র দায়ী বলে তারা অভিযোগ করত। ভারতের সব সদর্থক নীতি ও প্রগতিকে তারা ফ্যাসিস্ট ও জাতীয়তাবাদী বলে দাগিয়ে দিত। তারা এমনকি এও বলত যে সিলিকন ভ্যালি টেক কোম্পানিগুলোতেও ব্রাহ্মণ সমস্যা রয়েছে। তারা বলে তাদের সাফল্যের মূলে ছিল তাদের জাতগত সুবিধা। অদ্ভুত যে তারা মুসলিম সংস্কৃতিকে সমর্থন করত যদিও মুসলিমরা এলজিবিটিকিউ, আন্দোলনকে সমর্থন করত না। তাদের ধর্মে নারী নিপীড়ণ নিয়ে কোন কথা অনুমোদিত ছিল না। তারা রাওকে সব হিন্দু পরিচয় মুছে ফেলতে বলত। সব সমর্থন প্রত্যাহারের ভয়ে ও লজ্জায় সে নিজের মূল হিন্দু পরিচয় গোপন করত।

যদি এলজিবিটিকিউ+ রা কারো বিরুদ্ধতা করতে চায় তবে তা করতে হয় ইসলামের বিরুদ্ধে। কারণ ইসলাম তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও দিতে চায় না। কিন্তু যেহেতু এলজিবিটিকিউ + বামদের আত্মপরিচয় এবং ইসলামও তাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তাই হিন্দুরা নির্যাতনকারী আর মুসলিমরা নির্যাতিত। ওকবাদ বা জাগরণবাদের একটা সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য হিন্দুবিদ্বেষ। তাই ওক আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত যে কোন গোষ্ঠি, যেমন এলজিবিটিকিউ +, এদের হিন্দুবিরোধিতা করতেই হবে। করণ কাটারিয়া নামে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্রকে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক করতে দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে। কারণ তাদের মতে হিন্দুরা মানবতাবিরোধী, ইসলামবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী। তার চরিত্রে কালিমা লেপন করা হয়েছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রশ্মি সামন্ত নামে এক ভারতীয় হিন্দু ছাত্রীকেও একইরকম হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছিল।

বিভিন্ন মঞ্চে ভারতীয়দের অসুবিধার মুখে ফেলা হচ্ছে এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো নয়ই বরং একটা সুসংহত ভেবেচিন্তে করা পরিকল্পনার অংশ—নব্য মার্ক্সবাদী ভারতবিরোধী আন্দোলন। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা বিশ্ববিখ্যাত গুগল, মাইক্রোসফ্টের মতো কোম্পানির শীর্ষে অধিষ্ঠান করছে তাদের মেধার জোরে নয়, ওরা বলে, উঁচুজাতের লোক বলে। তেনমোজি সৌন্দররাজন বলে এক ভারতীয় হিন্দু নারী এসবের অন্যতম পাণ্ডা। সে 'ইকুয়ালিটি ল্যাব' নামে এক সংগঠন চালায়। এই সংস্থাকে অলাভজনক বলে ঘোষণা করা হয়নি, কারণ সেক্ষেত্রে তাকে অর্থের উৎস উন্মোচন করতে হবে। সিস্কো সিস্টেমের বিরুদ্ধে ২০২০ সালে জাত-বৈষম্যের অভিযোগ আনা হয় কারণ ওরা ভারতীয়দের সবাইকে জাতভেদের দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ করে। দুজন ব্রাহ্মণ অফিসারের বিরুদ্ধে এক মনগড়া অভিযোগ আনা হয় যে তারা এক দলিত প্রার্থীর সঙ্গে জাতবৈষম্য করেছে। পরে সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ওরা রেসিজমের আইনে তথাকথিত জাত বা কাস্ট সিস্টেমের অপরাধের বিচার করে। আর একজন ভারতীয় হিন্দু মহিলা ক্ষমা সাওন্ত নিজেকে ট্রটস্কিপন্থী, লেনিনপন্থী বলে দাবী করে। সে সিয়াটলে একটা আইন আনায় নেতৃত্ব দিয়েছে যাতে যে কোন কাস্টভিত্তিক বৈষম্যকে রেসভিত্তিক বৈষম্যের আইনে বিচার করা যাবে। ভারতের সংবিধানে জাতভিত্তিক সব রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবুও ওরা নাছোড়বান্দার মতো জাতব্যবস্থাকেই অদৃশ্য ছায়াশত্রুর মতো তার বিরুদ্ধে কামান দাগে। এর মতলব হল এইভাবে হিন্দুদের মধ্যে যদি বিরোধ লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে ওদের ভেঙে ফেলা সহজ হবে। আমেরিকার প্রতিটা স্কুলে ভারতীয় ছাত্রদের মাথায় মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের ধর্ম জাতভেদে দীর্ণ এবং অত্যন্ত খারাপ একটা ধর্ম। ওদের শেখানো হয় যে রাম একজন নারীবিদ্বেষী ছিল, তাই তারা রামনবমী করবে না। তারা মন্দিরেও যেতে চায় না শুধু ক্রমাগত হিন্দুবিরোধী বিষোদ্গারের ফলে।

প্রাকৃতিকভাবে সমস্ত স্পিসিজের মতো নারী পুরুষ এই দুই লিঙ্গে বিভক্ত। মাত্র .০১ শতাংশের মধ্যে কিছু লিঙ্গগত সমস্যা দেখা দেয়। তার জন্য এই ব্যবস্থাকে তুচ্ছ করে মানুষকে এলজিবিটিকিউ+ এর মতো অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করার লক্ষ্য সব তালগোল পাকিয়ে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে টোটালিটারিয়ান ব্যবস্থা কায়েম করা। মুসলমানদের মধ্যে কখনোই এই এলজিবিটিকিউ ঢোকাতে পারবে না। খ্রিস্টানরাও যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিশ্বের সব বাস্তুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ওদের হাতে। তাই এর অন্তিম চূড়ান্ত শিকার হবে হিন্দুরা। ভারতীয় বিচার বিভাগও এর শিকার। তারা সমকামী বিবাহে আইনি বৈধতা দিয়েছে।

বিবাহবহির্ভুতকে একসঙ্গে থাকার অধিকার দিয়েছে নারীপুরুষকে, লেসবিয়ানকে সাংসদ (মেনকা গুরুস্বামী), সমকামীকে (সৌরভ কৃপাল) বিচারপতি করার মান্যতা দিয়েছে। উদ্দেশ্য বিবাহ ব্যবস্থাটাকেই বানচাল করে দেওয়া। আবার এর শিকার হবে হিন্দুরা।

কিন্তু কেন হিন্দুবিদ্বেষ?

উপরে যে চিত্র দেখানো হয়েছে তার প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হলুদ অংশটিতে এখনো সাকার দেবতন্ত্রনির্ভর প্রাচীন ধর্ম টিকে আছে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য সর্বত্র আগে সাকারবাদ চালু থাকলেও বর্তমানে তা নেই সবই আব্রাহামিকদের দখলে। অনেক কষ্টে সেই হলুদ ভূখন্ডে সাকার ধর্ম টিকে আছে অজস্র প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে। আর তাই এত অস্থিরতা। একমাত্র ভারতবর্ষে (যদিও বহুখণ্ডিত) বা তার ভগ্নাংশে এখনো সেই আদি সুসভ্য ধর্ম বিরাজমান এবং ক্রমশঃ তার প্রতিভার বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ সারা পৃথিবীকে আলোকিত করছে আর সেটাই সহ্য হচ্ছে না আব্রাহামিক অন্য ধর্মের। উপরের মানচিত্র খেয়াল করলে দেখা যাবে গোটা ইউরোপ, দুই আমেরিকা মহাদেশ ও ওশিয়ানিয়া মহাদেশ জুড়ে খ্রিস্টান ধর্ম দখল করে ফেলেছে। সব জায়গাতেই খ্রিস্টানধর্ম প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সুসভ্য ধর্মবিজড়িত সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উর্দ্ধ আকাশে ডালপালা ছড়িয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশেও তাই কিন্তু বর্তমানে যা ছবি দেখছি তাতে পরিস্কার যে সেখানে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এবার আসি এশিয়ার কথায়। এখানে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কুরেশ আদি পৌত্তলিক ধর্মকে পদদলিত করে ইসলামের ধ্বজা উড়ছে প্রবল বিক্রমে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া ছিল হিন্দু, বৌদ্ধর দেশ, সেখানে এখন ইসলামিক দেশ। ফিলিপাইনস ছিল হিন্দু-বৌদ্ধর দেশ, বর্তমানে সেটা খ্রিস্টান দেশ। সেখানে আবার একটা অংশে মুসলিমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। খাবলা মেরে বার করে নিয়েছে। দুই কোরিয়াতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রবলবেগে প্রসার লাভ করছে। চীনে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার বাড়ছে। মায়ানমার, থাইল্যান্ড বৌদ্ধপ্রধান দেশ হলেও সেখানে মুসলিমদের জমি দখলের লড়াই চলছে।

ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা এত প্রাচীন ও এর দর্শন এত উন্নত ও সমৃদ্ধ এবং এর জনসংখ্যা বিশ্বের ধর্মগোষ্ঠিগুলোর মধ্যে তৃতীয় হওয়ায় একে সহজে মুছে ফেলা যাবে না। তাই তাবৎ বিশ্বের ধর্মগুরু এবং তাদের চালিত রাষ্ট্রনায়ক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একে উপড়ে ফেলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা ততটাই প্রবল। সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি এইখানে নিবদ্ধ। কারণ হিন্দুরা তাদের ধর্মরক্ষায় সজাগ হচ্ছে দেখে অন্যরা বিচলিত ও তারা মিথ্যা শোরগোল তুলছে। *(সমাপ্ত)*

তিনশো একুশ

সৌমিত্র ঘোষ

ধর্মের কল বাতাসে নড়ার বার্তা দিয়ে
মেঘের বুকে তিনশো একুশ চালায় তরী
পাঁচ বছরের রক্তস্রোতের ঢেউ পেরিয়ে
আজকে আবার ইচ্ছে হলো কলম ধরি!!

বুকের ভেতর ভাগ্যিস একটু পাথর পোঁতা
যন্ত্রণাকে তাই সহজে মানুষ করা...
তলোয়ার ধার, বাড়লে বয়স হবেই ভোঁতা
জানিয়ে দিল এই বাংলার বসুন্ধরা!!!

গণ শব্দের লিখন ওরা করুক ফিকে
তঞ্চকতার আস্ফালনে উঠুক ফেঁপে
সূর্য্য কিন্তু রোজই ওঠে পূর্বদিকে
মর্জিমতো তাপমাত্রা নিজেই মেপে!

আমিত্বতেই কাটালে এক যুগের বেশি
সেবার পথে খুঁড়লে যখন গণর কবর
বোঝোনি হায় শক্তি হারায় শক্ত পেশি
মানুষ যখন পথের বুকে জানায় খবর!

কুঁড়ের থেকেই রাত পোহালেই অট্টালিকা!
শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য সব পাঠিয়ে চুলোয়!
দেখতে পাওনি কোটি কোটি হাতে অগ্নিশিখায়—
দর্প হঠাৎ ছাই হয়ে আজ ভাসছে ধুলোয় !!

সেই ধুলোকেই মলিন করে বৃষ্টি এল
গ্রাম শহরে ভাসলো আবার কাগজ তরী
আগাম ঝড়ের হৃদয় জুড়ে আভাস ছিল...
বার্তা উড়ুক ভেবেই আবার কলম ধরি...

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রাসঙ্গিকতা
হিন্দুস্তানের খ্রিস্টায়ন ও ইসলামায়নের অতীত ও বর্তমান

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

পার্ট-২

হিন্দু শূন্য কাশ্মীর পর্ব বাদ দিলেও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুরুতেই পাকিস্তানের লাহোর, পাঞ্জাব, ঢাকা এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে হিন্দু শিখ নিধন ও বিতাড়ণ যজ্ঞ শুরু হতে থাকে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নারীর বলাৎকার এবং হত্যা হয়েছে। এটাই তো পাকিস্তানি মুসলমান শাসকের চরিত্র এবং যাঁরা এই ভারতে রয়ে গেছে, তারা তো পাকিস্তানের দোসর হিসেবে ক্রীড়ণক হয়ে হিংসার বীজ ছড়িয়ে চলেছে। আজাদির দাবি নিয়ে তারা ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় কিংবা যে কোন রাজনৈতিক অরাজকতায় শ্লোগান দিয়ে থাকে, 'জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান, তেরি জান মেরি জান পাকিস্তান পাকিস্তান, তেরি মন্ডি মেরি মন্ডি রাওয়ালপিন্ডি, রাওয়ালপিন্ডি।' কাশ্মীরিরা বলে, 'আমরা পাকিস্তানি। পাকিস্তান আমাদের। ইসলাম ধর্ম আমাদের এক সূত্রে গ্রোথিত করেছে।' (সূত্র : The Times of India, ২৪.৮.২০০৮)। এই প্রসঙ্গে ড. আম্বেদকর বলেছেন, 'ইসলামের বিধান অনুসারে মুসলমান যেমন কখনও ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে ভাবতে পারে না, তেমনি হিন্দুকেও ভাবতে পারে না আত্মীয় বলে' (সূত্র : Writing of Speeches Vol.-VIII page ৩৩০-৩৩১)। আবার গান্ধীজি বলেছেন, 'জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানেরা কোন আগ্রহ দেখায়নি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য। তারা ভারতকে নিজের দেশ বলে মনে করে না।' (সূত্র : The Young India ২৯.৪.১৯২৫)

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে সকল উদ্বাস্তু হিন্দু পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিল, তারা আজও ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। আর যখন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের নাগরিকত্ব দিতে বিল পাস করায়, তখন বিরোধী দলগুলো ও ইসলামের পরিতোষণকারী নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ভারতে অবস্থানকারী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা ভোটলোভী রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তায় পাকিস্তানের মদতে অবরোধ, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ করে দেশের সম্পদ বিনষ্ট করতে মেতে উঠেছে এবং তাদের শ্লোগান ছিল, 'আজাদী-আজাদী'। পাকিস্তানের সঙ্গে আজ পর্যন্ত তিনটি বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছে, যথাক্রমে ১৯৪৭, ১৯৬৪ এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। আর প্রতিটি যুদ্ধে তারা গো-হারা হেরেছে। কিন্তু তাতেও ভারতের ঘরশত্রু বিভীষণ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ভোটের জন্য মুসলমানদের মদত দিয়ে চলেছে অর্থাৎ নিজের নাক কেটে, স্বদেশের বুকে ছুরি মেরে আত্মঘাতি কর্মে মেতে উঠেছে। যার ফলশ্রুতিতে এই ভারতে আজ হিন্দু বলতে সাম্প্রদায়িক বোঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ববাদ এক অলীক পর্যায়ে চলে গেছে।

আবার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালি হত্যা করেছিল এবং ৪ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছিল, যার অধিকাংশই ছিল হিন্দু নর-নারী। এই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পূর্ব পাকিস্তানের সকল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিল। আমার প্রত্যক্ষ দেখা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামের কথা উল্লেখ করছি। এই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মে মাসের ৩ তারিখে মোজাফ্ফরাবাদ গ্রামে পাক হানাদার বাহিনী রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালিয়ে পুরো গ্রাম লুটপাট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। কেননা তাদেরকে বলা হয়েছে এই গ্রামের মালাউনরা সকলেই মুক্তিবাহিনীর সদস্য। একই দিনে পাক হানাদার বাহিনী ৩০০-৪০০ হিন্দুকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে এবং বলাৎকার করে প্রায় ২০০ হিন্দু নারীকে। ৮ থেকে ৮০ বছরের কোন হিন্দু মহিলাই বাদ যায়নি। সেদিন রক্ষাকালী বাড়ি সহ গ্রামের সকল মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাক সেনারা সেদিন অপারেশন শেষ করে অনেক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের পৈশাচিক ঘটনায় আমার সেই জ্ঞাতি দাদার মেয়ে গীতা, যে আমাকে জলে ডুবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, তারও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। জানি না সে আজ জীবিত না মৃত, আর বেঁচে থাকলে কোথায়, কেমন আছে কে জানে? এমনি ভাবেই সারা পূর্ব-পাকিস্তানে কত মা-বোন যে অত্যাচারিত ও নিখোঁজ

হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং পাকিস্তানের পূর্ব অংশ থেকে পাক হানাদার মুক্ত করে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হয়ে তা হয়ে গেল, আরেকটি মুসলিম রাষ্ট্র।

অতঃপর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ভারতে অযোধ্যার তথাকথিত বাবরি মসজিদ (যা অতীতে বর্বর সম্রাট বাবরের নির্দেশে রামমন্দির ভেঙে বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদ করা হয়েছিল। অযোধ্যার সেই রাম জন্মস্থানে নির্মিত বাবরি মসজিদ স্থলে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আইনী বিচার মতে সুদীর্ঘ ৩০ বছরের, তথাকথিত মসজিদ ভাঙার সময়কাল থেকে হিন্দুদের রাম জন্মভূমির ইতিহাস পর্যালোচনা করে রামচন্দ্রের জন্মস্থান রূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আর মুসলমানদের মসজিদ তৈরির জন্য অযোধ্যা শহরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যা মুসলমান মামলাকারীরা মেনে নিয়েছে।) ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অহিন্দু দুষ্কৃতিকারীরা প্রায় আড়াই হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে আবারও হিন্দু বিতাড়ণ শুরু করে। বাংলাদেশের হিন্দুরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং দফায় দফায় আজ পর্যন্ত নির্যাতিত হয়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয়েছে, একটু সুখ, শান্তিতে হিন্দু ধর্মের ছায়াতলে বসতের আশায়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, উদ্বাস্তুরা এখানে এসে কি দেখল?

এই ভারত (হিন্দুস্তান) ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে স্কুল কলেজ হিন্দু ধর্মের বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত তথা ধর্মের পাঠ নিষিদ্ধ। কিন্তু সরকারি অর্থে পরিচালিত মাদ্রাসা, ইসলামিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয়। শুধু তাই নয় মুসলমানদের জন্য সুন্নাত মতে শরীয়তি আইনও যথাযথ প্রতিপালন করা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অর্থে মুসলমানদের হজ যাত্রার ব্যবস্থাও রয়েছে (বর্তমান অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তা বন্ধ করা হয়েছে, কেননা ইসলামি মতে তা উচিত নয় বলে)। কিন্তু হিন্দুদের তীর্থযাত্রায় তীর্থ কর (tax) দিতে হয়। এই ভারতে সংস্কৃত ভাষার জন্ম এবং ভাব ভাষা কৃষ্টির উন্মোচন ঘটেছিল, যে ভাষায় রচিত হয়েছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। তাছাড়াও বিজ্ঞান চর্চা ও বহু কালজয়ী গ্রন্থাবলীও লিখিত হয়েছিল এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। অথচ বর্তমানে সংস্কৃত ভাষাকে বলা হয় এক মৃত ভাষা। যে কারণে হিন্দুরা গীতা সহ হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পড়াই ভুলে গেছে। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রতিনিয়ত শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ ও চর্চা করে থাকে। আবার থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি সমূহের নামকরণের প্রয়োগ আজও চলে আসছে। সেক্ষেত্রে এসব ধর্মশাস্ত্রের চর্চা নেই বললেই চলে। শুধু সংস্কৃত চর্চাই নয়, হিন্দু ধর্ম শিক্ষায়ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বালাই নেই। প্রায় হাজার বছর ধরে ইসলামী বহিরাগত শাসক ও দুইশত বছর ধরে ইংরেজ খ্রিস্টান শাসকদের পদানত থেকে এই ভারতের হিন্দুরা তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্মাচরণকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছে। অতীতে ভারতের হিন্দুরা অপসংস্কৃতি, ধর্মের কুসংস্কার, পতি বিয়োগে সহ-মরণ, বৈধব্য যন্ত্রণা, জাত-পাতের বর্ণ বৈষম্যের ভ্রান্ত নীতিকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের শ্মশান নিজেরাই জ্বালিয়ে ছিলেন, যা থেকে আজ অনেকটাই মুক্ত হিন্দু সমাজ। আবার তো স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেও ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা নিজেদের আবাসভূমি (যা শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জন্মস্থানকে) নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।

হিন্দু রাজনীতি করা রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে কংগ্রেস ও ধর্মহীন বামপন্থীরা মনে করে হিন্দুদের ভোট পাই না কেন, মুসলমানদের ভোট পুরোটা পেলে ক্ষমতায় তারা থাকবে। অতএব হিন্দু তোষণের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের চাই শুধু অহিন্দু ভোটব্যাঙ্ক। হিন্দু ধর্ম, হিন্দুত্ববাদিতা, হিন্দু দেশ যাক না রসাতলে। অথচ কি আশ্চর্য এই পৃথিবীতে যে কটি রাষ্ট্র আছে, তার সবকটিই সংখ্যাধিক্য ধর্মের জনগণের শাসকরা সেই ধর্মের অনুসারী। আর প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় ধর্ম রয়েছে। ইসলাম শাসনে থাকা দেশের রাষ্ট্রধর্ম হল ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান শাসিত দেশের রাষ্ট্র ধর্ম খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধ শাসিত দেশের রাষ্ট্রধর্ম বৌদ্ধধর্ম। একটি মাত্র দেশ ছিল নেপাল, যার রাষ্ট্রধর্ম ছিল হিন্দুধর্মের। কিন্তু বর্তমানে সে দেশে মুসলমান এবং পাকিস্তানি জঙ্গি বাহিনী এবং নেতৃত্বে বামমনস্ক বীজ রোপিত হয়ে হিন্দুধর্ম ছেড়ে জগাখিচুরি অর্থাৎ না-বাম, না-ইসলাম, না-বৌদ্ধ এমনিতর পাঁচমিশালী হয়ে তাদের হাতের পুতুল এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং ভারতের সঙ্গে সীমানা দখলে মত্ত হয়ে পড়েছে। আর পৃথিবী হিন্দু আধ্যুষিত একটি রাষ্ট্র ভারত (হিন্দুস্তান/ইন্ডিয়া) হল যার

কোন ধর্মই নেই অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

যদিও এই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হল হিন্দু, অথচ দেখুন সাধারণ হিন্দু জনতা বাদ দিলেও ভারতের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনেতারাও উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। যেমন—

১) ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এসেছেন পাঞ্জাবের ঝিলম জেলার গাহগ্রাম থেকে (যাঁর ঠাকুরদাকে সেখানে মুসলমানরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল)।

২) পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত কুমার পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত কুমার শূর এসেছিলেন নোয়াখালি থেকে (তাঁর পিতা নগেন্দ্র কুমার শূরকে মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা করেছে)।

৩) বরিশালের তপশীলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লীগের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিন্দু মুসলমানের স্বর্গ করতে পাক-ই-স্তান-এর অর্থ করেছিলেন 'পবিত্রভূমি'। কিন্তু পরিশেষে তিনি পূর্ববঙ্গে হিন্দু নিধন যজ্ঞের ভয়াবহ রূপ দেখে কলকাতায় পালিয়ে এসে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই অক্টোবর পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

৪) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘকালের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ছিলেন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অধিবাসী। যিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কয়েকবার দিল্লি গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম হত্যাযজ্ঞের অন্যতম হোতা। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে এই মহান ভারতের কি অবস্থা যে হতো তা সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়।

৫) ভাজপা-র অধিসংবাদিত নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীজিও উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তিনিও পাকিস্তানে গিয়ে জঘন্য ও ঘৃণিত চরিত্রের জিন্নাকে (পাকিস্তানের জনক) ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রশংসিত করেন এবং তার কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

৬) আবার অনেক নেতা-নেত্রী মুসলমান ও খ্রিস্টান বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হয়ে দেশের কর্ণধার হয়ে বসেছেন। যেমন—ইন্দিরা গান্ধী লন্ডনে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, ফিরোজ খানকে বিয়ে করে ফারজানা বেগম নামধারণ করেন। যে কারণে ইন্দিরাজিকে পুরীর মন্দিরে ঢুকতে দেয়নি পণ্ডিতরা। ইন্দিরা পুত্র রাজিব গান্ধীও খ্রিস্টান হলেন এবং রবার্টো নাম নিয়ে বিয়ে করেন সোনিয়া মাইলো নামে ইটালিয়ান খ্রিস্টান মহিলাকে। যে কারণে রাজীব গান্ধীকে নেপালের মন্দিরে পুরোহিতরা ঢুকতে দেননি। তাঁরই মেয়ে প্রিয়াঙ্কা বিয়ে করেন রবার্ট ভদ্রা নামে এক খ্রিস্টান ছেলেকে। রাহুল গান্ধীও পৈতৃক সূত্রে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

৭) ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "I am a Christian by education, I am a Muslim by culture and I am a Hindu by ancient of birth." এই নেহরু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত সোমনাথ মন্দিরের দ্বার উদঘাটনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রমেশচন্দ্র প্রসাদকে যেতে সরাসরি আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি, নেহরুর আপত্তিকে মান্যতা না দিয়ে সোমনাথ মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য অতীতে এই সোমনাথ মন্দির ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাশেম, ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহসুদ, ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজী এবং সর্বশেষে ঔরঙ্গজেব প্রমুখ মুসলমান বর্বর নরপিশাচ শাসকরা শিবলিঙ্গটি ভাঙচুর করে মন্দিরের সকল ধন-রত্ন লুটপাট করে হিন্দুদের হত্যা এবং হিন্দু নারীদের বলাৎকার করেছে। তবে মুসলমানরা যতবার ভেঙেছে, ততবারই হিন্দুরা সোমনাথ মন্দির তৈরি করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছে।

আবার আমাদের ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসি নেতা জাকির হোসেন, জিন্নাকে এক পত্রের মাধ্যমে (৩০.৬.১৯৪৭) নতুন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ে তুলতে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (সূত্র : দৈনিক ডন ১৪.৮.১৯৯০)। তিনি আবার রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি মসজিদ স্থাপন করেছেন। এই তো ভারতবর্ষের মুসলমানদের চরিত্র। অথচ আজ অব্দি অনেক হিন্দু, শিখ, জৈন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। কিন্তু কেউই কোন মন্দির রাষ্ট্রপতি ভবনে স্থাপন করার মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ ভারতের সকল মুসলমানদের ইচ্ছা এই দেশ যতদিন না দারুল ইসলামে পরিণত হচ্ছে, ততদিন তারা ক্ষান্ত হবে না। আর আমরা বোকার হদ্দ হিন্দুরা ভোট বাক্সে লড়াই করে চলেছি। অপরদিকে মুসলমানরা সুন্না মতে চারটে বিয়ে আর তালাক প্রথার মাধ্যমে অগুন্তি বিয়ে করে, শুধুমাত্র সন্তান জন্ম দিয়ে ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। এর পরিণতি কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা কি হিন্দুদের আছে?

(ক্রমশঃ)

श्री विग्रह पूजनविधि

अरुण चूड़ीवाल

पुरुषोत्तम माह 2083 का यह समय है।

इस माह में भगवान के पूजन एवं श्रीमद्भगवत् पुराण श्रवण का विशेष महत्त्व है।

श्रीमद्भगवत् पुराण कथाओं में एकादश सम्बन्ध की स्वल्प चर्चा होती है। एकादश स्कन्ध, गीता ज्ञान सहश्य परिपूर्ण है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण परम मित्र अर्जुन के साथ ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग का विवेचन करते हैं। इसी प्रकार एकादश स्कन्ध में भगवान श्रीकृष्ण परम मित्र उद्धव के साथ भी उन्हीं विषयों की व्याख्या करते हैं।

एकादश स्कन्ध के 27वें अध्याय का शीर्षक है क्रियायोग। इस अध्याय के 44वें श्लोकों में भगवान नित्य पूजन हेतु श्रीविग्रह (मूर्ति) निर्माण की विधि से सम्पूर्ण पूजन विधि का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित वर्णन करते हैं—

उद्धवजी ने पूछा—भक्तवत्सल श्रीकृष्ण! जिस क्रियायोग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा-पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोग का वर्णन कीजिये।

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, मेरी पूजा की तीन विधियाँ हैं—वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिये।

भक्तिपूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में चाहे किसी में भी आराधना करे।

उपासक को चाहिये कि प्रातःकाल दतुअन करके पहले शरीरशुद्धि के लिये स्नान करे।

उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ सङ्कल्प करके वैदिक विधियों से कर्मबन्धनों से छुड़ानेवाली मेरी पूजा करे।

मेरी मूर्ति आठ प्रकार की होती है—पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चन्दन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी।

चल और अचल भेद से दो प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान् का मन्दिर है। उद्धवजी! अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये।

परन्तु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिये। मिट्टी और चन्दन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे।

उद्धवजी! स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं।

बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रों के द्वारा अङ्ग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिये।

जब मुझे कोई **भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ**।

जब मैं भक्ति-श्रद्धापूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है।

उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले।

तदनन्तर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह कर के पवित्रता से उन कुशों के आसनपर बैठ जाय। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जानेपर हृदयकमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखा के समान मेरी जीवकला का ध्यान करे।

सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य शाङ्ख, कौमोद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन आट आयुधों की पूजा आट दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजयन्तीमाला तथा श्रीवत्सचिह्न की वक्षःस्थलपर यथास्थान पूजा करे।

प्रतिदिन चन्दन, खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराये।

मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और चन्दनादि से प्रेमपूर्वक यथावत् मेरा शृङ्गार करे।

उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे।

यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पूए, लडडु, हलुआ, दही और दाल आदि विविध व्यञ्जनों का नैवेद्य लगावे।

भगवान् के विग्रह को दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत आदि से स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वर्वोक अवसरपर नाचने-गाने आदि का भी प्रबन्ध करे।

उद्धवजी! नदनन्तर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुण्ड में अग्नि की स्थापना करे।

तदनन्तर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे।

मेरी मूर्ति तपाये हुए सोने के समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोम से शान्ति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भुजाएँ शोभायमान हैं। उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं। कमल की केसर के समान पीला-पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिरपर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाँहों में बाजूबंद झिलमिला रहे है। वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न है। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिये। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे।

इस प्रकार अग्नि में अन्तर्यामीरूप से स्थित भगवान् की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे।

तदनन्तर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्मस्वरूप भगवान् नारायण का स्मरण करे और भगवत्स्वरूप मूलमन्त्र ‘ॐ नमो नारायणाय’ का व करे।

इसके बाद भगवान् को आचमन करावे और उनका प्रसाद निवेदन करे।

इसके पश्चात् अपने इष्टदेव की सेवा में सुगन्धित ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पाञ्जलि समर्पित करे।

मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला-कथाएँ स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। ऋषियों अथवा भक्तों द्वारा बनाये हुए स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे—‘भगवन्! आप मुझपर प्रसन्न हों। मुझे अपने कृपाप्रसाद दें।’ नदनन्तर दण्डवत्-प्रणाम करे। अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दायें से दाहिना और बायें से बायाँ चरण पकड़कर कहे—‘भगवन्! इस संसार-सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभो! आप मेरी रक्षा कीजिये।’

इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमा में से`क दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गयी है। बस, यही विसर्जन है। ■

শোকবার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি গত ২৫শে মে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। জানা গেছে, লিভারের সংক্রমণের কারণে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ওঁনাকে ভর্তি করা হয়েছিল। ওঁনার জন্ম ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এক পারসি পরিবারে হয়েছিল। ওঁনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

....

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্য প্রান্তবঙ্গের জঙ্গিপুর নগরে, কার্যকর্তা বাপি রবিদাসের পুত্র সন্তান, সাগর রবিদাস মাত্র ৬ বছর বয়সে, গত ২১শে মে, বৃহস্পতিবার বহরমপুর জেলা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনায় আমরা সকলেই মর্মাহত। অন্তিম সংস্কারের সময় প্রান্তের সহ-সম্পাদক শ্রীঅসীম রায় এবং অন্যান্য কার্যকর্তারা উপস্থিত থেকে সমস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানায়। সাগর রবিদাসের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। ওঁম শান্তি। ওঁম শান্তি।

“We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded and by which one can stand on one’s own feet.”

—Swami Vivekanand

প্রান্ত পরিষদ প্রশিক্ষণ বর্গ, গোপালী আশ্রম, খড়্গপুর, দক্ষিণবঙ্গ

পরিষদ শিক্ষা বর্গ, খড়মাডাঙ্গা, উত্তর বীরভূম, মধ্যবঙ্গ

বজরঙ্গ দলের শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ, গোপালী আশ্রম, খড়্গপুর, দক্ষিণবঙ্গ

জওয়ানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ, আমতা শিশু মন্দির, হাওড়া, দক্ষিণবঙ্গ

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’ সম্পর্ক অভিযান

সম্পর্ক অভিযান, মাননীয় উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যবঙ্গ

মাননীয় আই.সি., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যবঙ্গ

সম্পর্ক অভিযান, আসানসোল, মধ্যবঙ্গ

সম্পর্ক অভিযান, গড়বেতা, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

সম্পর্ক অভিযান, কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ

সৌজন্যে :

‘চর অচর অর্পণ ন্যাস’ (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in